প্রত্যেকখানি ।• চারি আনা

	গোখেল	— হরিশ্চন্দ্র সেন
*	সার সৈয়দ আহম্মদ	— নবগোপাল দাস
	শশিভুষণ চট্টোপাধ্যায়	— বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রত্যেকখানি ।৵• ছয় আনা

*	মা ও খুকু	— হেমেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য
*	খুকুর ছড়া	— ঐ
*	ভক্তির ডোর	— সত্যচরণ চক্রবর্ত্তী
*	বেদানা	— হরিপ্রসন্ন দাশগুপ্ত
*	রঙ্গিলা	— ঐ
	শৈব্যা	— নরেন্দ্রনাথ মজুমদার
	গান্ধারী	— অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
	বাসবদত্তা	— বসন্তকুমার দাস
	মধ্যম ও কনিষ্ঠ	— অবিনাশচন্দ্র দাস
*	ছেলেদের পূজার কথা	— রাজকুমার চক্রবর্ত্তী

প্রত্যেকখানি ॥• আট আনা

*	পরশমণি	— বরদাকুমার পাল
*	সুরের পরশ	— অনিন্দিতা চৌধুরী
*	রূপকথার আসর	— প্রভাতকুমার শর্ম্মা
*	ঝুমঝুমি	— নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত
*	পারিজাত	— ঐ
*	মণ্টুর এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট	— ঐ
*	নাগরদোলা	— হেমেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য

প্রত্যেকখানি ॥০ আট আনা

* টুলটুল	—	কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত
* জয়ডঙ্কা	—	ঐ
* রুনুঝুনু	—	ঐ
ফুলঝুরি	—	ঐ
ফুলঝুরি (হিন্দী সংস্করণ)	—	ঐ
* আগডুম-বাগডুম	—	ঐ
ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসি	—	ঐ
* চোর জামাই	—	বন্দে আলী মিয়া
বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা	—	ঐ
* হর্‌রা	—	স্থনির্ম্মল বসু
* কুম্‌কুম্‌	—	ঐ
* ঝিল্‌মিল্‌	—	ঐ
* আল্‌পনা	—	ঐ
* পাতাবাহার	—	ঐ
চূড়ামণি	—	বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য
* পূজার ছুটি	—	ঐ
* অলখ্‌ চোরা	—	ঐ
* সাঁঝের বাতি	—	ঐ
* বাদুড়-বয়কট	—	ঐ
গুজরাটি হাতী	—	গোপাল ভট্টাচার্য্য
* রাজকুমার	—	নীহাররঞ্জন গুপ্ত
* সাতসমুদ্র তেরনদীর পাড়ে	—	ঐ

শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, বি. এস্‌-সি.

মূল্য দশ আনা

প্রকাশক

বৃন্দাবন ধর এণ্ড্ সন্স্ লিঃ

স্বত্বাধিকারী—আশুতোষ লাইব্রেরী

৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ;

৩।৮নং জন্‌সন্ রোড্, ঢাকা

১৩৪৮

মুদ্রাকর

শ্রীপরেশনাথ ব্যানার্জ্জী

শ্রীনারসিংহ প্রেস

৫নং কলেজ স্কোয়ার

কলিকাতা

সূচীপত্র
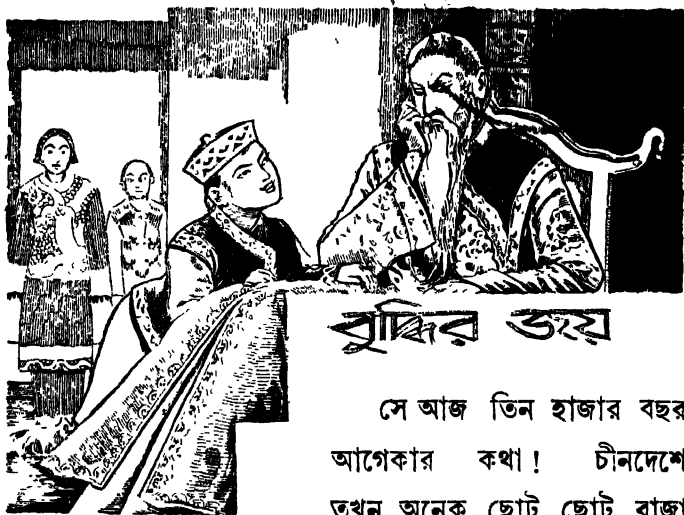
বুদ্ধির জয়

সে আজ তিন হাজার বছর আগেকার কথা! চীনদেশে তখন অনেক ছোট ছোট রাজা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতেন।

চুং ফো-ও ছিলেন এমনই একজন স্বাধীন রাজা। ছোট রাজা, ছোট তাঁর রাজ্য! কিন্তু তাঁর সুশাসনে প্রজাদের কোন দুঃখকষ্ট ছিল না। প্রজারা যেমন রাজাকে ভালোবাসতেন, রাজাও তেমনি প্রজাদের সুখশান্তির জন্য দিন রাত ভাবতেন।

কিন্তু রাজ্যের এ সুখশান্তি বেশীদিন রইল না। এর উপর চীন সম্রাটের নজর পড়তেই তিনি এর স্বাধীনতাটুকু হরণ করবার সঙ্কল্প করলেন। শেষে একদিন সম্রাটের একদল সৈন্য এসে ছোট রাজ্যটিতে হানা দিলে।

চুং ফো দেখলেন, মহা বিপদ্ ! এক দিকে দেশের স্বাধীনতা, আর একদিকে যুদ্ধ-বিগ্রহে প্রজাদের ধনপ্রাণ নাশ !

অমনি মন্ত্রী সেনাপতি সকলকে নিয়ে তিনি মন্ত্রণাসভা বসালেন। সে সভায় কি স্থির হ'ল তাঁরাই জানেন। দেখা গেল, সম্রাটের সৈন্য হাঁকডাক বন্ধ ক'রে দিন-কয়েকের জন্য চুপ ক'রে গেল, আর এদিকে চুং ফো-র হাতীশালার সব চেয়ে বড় হাতীটি নিয়ে একজন দূত চীন সম্রাটের রাজধানীর দিকে রওনা হ'ল।

যথাসময়ে দূত সম্রাটের রাজধানীতে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। রাজসভার দোরগোড়ায় হাতীটি বেঁধে রেখে সে সম্রাট্‌কে আভূমি নমস্কার ক'রে তাঁর হাতে একখানা চিঠি দিলে।

চিঠিতে লেখা ছিল, রাজা চুং ফো চীন সম্রাটের নিকট একটা হাতী পাঠাচ্ছেন, এটাকে জ্যান্ত রেখে তিনি যদি এক দিনের মধ্যেই এর ঠিক ঠিক ওজন বলতে পারেন, তবে রাজা বিনা যুদ্ধেই সম্রাটের অধীনতা মেনে নেবেন। কিন্তু সম্রাট্ যদি তা' না পারেন, তবে যেন তিনি দয়া ক'রে তাঁর সমস্ত সৈন্য-সামন্ত ফিরিয়ে আনেন এবং আর কোনদিন যেন চুং ফো-র রাজ্যের দিকে পা না বাড়ান।

চিঠি পড়েই সম্রাট্ রেগে আগুন হয়ে উঠলেন। অমনি দূতের মাথা কাটবার হুকুম হ'ল।

দূতটি ছিল বুদ্ধিমান্। তাই সম্রাটের হুকুমে ঘাব্ড়ে না গিয়ে সবিনয়ে বল্লে—"মহারাজ! আমার মাথা কাটা এমন আর শক্ত কি! সে ত' তলোয়ারের এক কোপের ব্যাপার। কিন্তু তাতে ত' প্রশ্নের মীমাংসা হবে না! তা' ছাড়া দেশের সবাই জানবে, আপনার এই বিরাট রাজ্যে এমন একটি লোকও নেই, যিনি রাজ্যের মুখরক্ষা করতে পারেন।"

কথাটা সম্রাটের মনে খুবই লাগলো। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রধান মন্ত্রীকে হুকুম দিলেন, যেমন ক'রেই হোক্ সেদিনের মধ্যেই হাতীটির ওজন বা'র করা চাই!

রাজার হুকুম শুনে ত' মন্ত্রীর একেবারে চক্ষু স্থির! কি ক'রে যে হাতীর মত এমন একটা বিরাট জিনিষের ওজন হতে পারে তা' তাঁর মাথায়ই এল না। প্রধান মন্ত্রী চাইলেন ছোট মন্ত্রীর মুখের দিকে, ছোট মন্ত্রী তাকালেন সভা-পণ্ডিতের মুখের দিকে, সভা-পণ্ডিত মাথা চুলকোতে চুলকোতে আবার আর একজনের দিকে তাকালেন। এমনি মাথা চুলকানী আর মুখ চাওয়াচাওয়ি-ই সার হ'ল।

শেষে প্রধান মন্ত্রী সাহসে ভর ক'রে সম্রাট্‌কে জানালেন, এত অল্প সময়ের মধ্যে এর ওজন বা'র করা অসম্ভব। কারণ হাতীর মত একটা বিরাট জীবকে পাল্লায় চড়িয়ে ওজন করার

মত নিক্তি তৈরী করতেই এক সপ্তাহ কেটে যাবে। দাড়ি পাল্লা ছাড়া ত' আর ওজন করা চলে না।

মন্ত্রী সম্রাট্‌কে আরও বুঝালেন, এ যে অসম্ভব তা' রাজা চুং ফো-ও জানেন। তাই তিনি কৌশলে সম্রাট্‌কে ধোকা দিয়ে নিজের স্বাধীনতাটুকু বজায় রাখবার ফন্দি এঁটেছেন!

রাজা মহারাজার মন! উজির মন্ত্রীরা যা' বুঝান তাই বুঝেন। সম্রাট্‌ও বুঝলেন, এ অসম্ভব। কেউ কোনদিন এ অসম্ভব সম্ভব করতে পারেনি, কোন দিন পারবেও না।

তাই তিনি রাজা চুং ফো-র দূতকে বল্লেন—"হাতীটি রইল। তোমার রাজাকে বলো, চালাকি করবার জায়গা এ নয়। তিনি এসে যদি হাতীর ওজন বা'র না করতে পারেন তবে তাঁর যে দশা হবে, সে আমার মনেই রইল।"

দূত সম্রাট্‌কে অভিবাদন ক'রে স্বরাজ্যে ফিরে গেল।

দূতের মুখে সম্রাটের আদেশ শুনে রাজা চুং ফো-র ত' চক্ষুস্থির! তাঁর নিজের জালেই যে তাঁকে এমন ভাবে আট্‌কা পড়তে হবে, তা' ত আর তিনি আগে ভেবে দেখেন নি!

অমনি যত দোষ গিয়ে পড়ল মন্ত্রীর ঘাড়ে! তাঁর বুদ্ধিতেই হাতী পাঠানো হয়েছে! এখন উপায়? মন্ত্রীও হতাশ হয়ে মাথা চুলকোতে লাগলেন।

চুং ফো রেগে টং হয়ে হুকুম দিলেন, হাতীর ওজন বা'র করবার উপায় ঠাওরাতে না পারলে মন্ত্রীর মাথা আর তাঁর কাঁধে থাকবে না।

রাজার আদেশ শুনে মন্ত্রী সারা পথ শুধু ভাবতে ভাবতেই বাড়ী ফিরলেন। তাঁর উদ্বেগ-মলিন চোখমুখ দেখে বাড়ীর সবাই একটা ভীষণ বিপদের আশঙ্কা করতে লাগলেন। অথচ কি যে ঘটেছে, ভরসা ক'রে তা' জিজ্ঞেস করতেও সাহস পেলেন না।

খান্ লো ছিল মন্ত্রীর একমাত্র ছেলে। বয়স ছিল মাত্র বারো। কিন্তু এই বয়সেই তার বুদ্ধির ধার দেখে সবাই তাকে ভালোবাসত। মন্ত্রীর ত' ছিল সে একবারে চোখের মণি!

দুপুর গড়িয়ে যায়, অথচ বাপের নাওয়া-খাওয়ার নাম নেই, রাজসভা থেকে ফিরে অবধি কেবলই কি ভাবছেন, দেখে খান্ লো ধীরে ধীরে তাঁর পাশটিতে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর তাঁর কাঁচা-পাকা চুলগুলোর ভেতর তার কচি কচি আঙুল বুলোতে বুলোতে আব্দারের সুরে জিজ্ঞেস করলে—"এত কি ভাবছো বাবা?"

মন্ত্রী জানতেন, তাঁর সমস্যার কথা ছেলেকে বলে কোন লাভই নেই; তবুও তাকে খুব ভালোবাসতেন বলে' একে একে সব কথাই খুলে বল্লেন।

বাপের কথা শুনে খান্ লো মিনিটখানেক চুপ ক'রে কি ভাবলে। তারপর ধীরে ধীরে বল্লে—"এ আর এমন কি শক্ত কাজ বাবা! তুমি নিশ্চিন্ত থেকো! আমি হাতীর ওজন বা'র করব।"

খান্ লোর ছেলেমানুষের মত উত্তর শুনে মন্ত্রী শুধু একটু-খানি হাসলেন। ভাবলেন, ছেলেমানুষ এ বিপদের গুরুত্ব কিইবা বুঝবে!

বুদ্ধিমান্ খান্ লো বাপের মনোভাব বুঝতে পেরে বল্লে—"সত্যি বলছি বাবা, হাতীর ওজন আমি বা'র করবই। এজন্য তুমি ভেবোনা।"

মন্ত্রী জিজ্ঞাসু নেত্রে ছেলের মুখের দিকে চাইতেই খান্ লো আব্দারের সুরে বল্লে—"এখন কিছু জিজ্ঞেস করতে পারবে না বাবা। হাতীর ওজন বা'র ক'রে সম্রাটের কাছ থেকে যেদিন এ দেশের স্বাধীনতার পাকাপাকি ব্যবস্থা ক'রে আসব, সেদিন সবই শুনবে।"

পরদিন খান্ লো বাপের সহিত রাজসভায় উপস্থিত হ'ল। মন্ত্রীর মুখে বালকের অভিপ্রায় শুনে চুং ফো ত' হেসেই অস্থির। বারো বছরের ছেলে, সে করবে এই জটিল সমস্যার সমাধান!

কিন্তু খান্ লো নাছোড়বান্দা। কাজেই রাজা বাধ্য হয়েই তাকে চীনদেশে যাবার অনুমতি দিলেন।

খান্ লো দূতের সহিত চীন সম্রাটের রাজধানী অভিমুখে রওনা হ'ল।

এতটুকু ছেলে করবে হাতীর ওজন! চীন সম্রাট্ খান্ লো-কে দেখেই রেগে একবারে অগ্নিশর্ম্মা! বল্লেন—"ঠাট্টা করবার আর জায়গা পেলেনা! বেশ দেখা যাক্, পারো ত' ভাল, নইলে রাজা চুং ফো-ও এর উপযুক্ত শিক্ষাই পাবেন।"

সম্রাটের কথায় খান্ লোর মুখে শুধু একটু হাসি ফুটে' উঠ্‌ল।

সে হাসিতে সম্রাট্ আরও জ্বলে উঠলেন। গম্ভীর সুরে বল্লেন—"বেশ! দেখা যাবে তোমার বুদ্ধির দৌড়। এজন্য তোমার কি কি চাই বলো।"

—"আমার তিনটি প্রার্থনা সম্রাট্।"

—"বলো!"

—"প্রথমে চাই একখানা বড় নৌকো।"

—"বেশ। তোমার দ্বিতীয় প্রার্থনা?"

—"আর চাই সমান ওজনের কয়েক হাজার ইট।"

—"তোমার তৃতীয় প্রার্থনা কি খান্ লো?"

"অভয় দিন সম্রাট্, যদি আমি হাতীর ওজন বা'র করতে

পারি, তবে আপনি কোনদিন আমাদের স্বাধীনতা হরণ করবার চেষ্টা করবেন না। শুধু তাই নয়, এ পর্য্যন্ত যাদের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছেন, তাদেরও আপনি আপনার শৃঙ্খল-পাশ থেকে মুক্তি দেবেন!"

ছেলেটির কথা বলবার ভঙ্গীতে সম্রাট্ মুগ্ধ হলেন। তিনি খুসী হয়ে বল্লেন—"তোমায় অভয় দিলাম, খান্ লো। তোমার তিনটি প্রার্থনাই আমি পূর্ণ করবো। নৌকো এবং ইট কাল নদীর ঘাটে প্রস্তুত থাকবে।"

মুহূর্ত্তের মধ্যে এ কথা রাজ্যময় ছড়িয়ে পড়লো। পরদিন ভোর হ'তে না হ'তেই রাজ্যের লোক দলে দলে নদীর ঘাটে ভেঙে পড়ল। সবার মনেই গভীর ঔৎসুক্য! হাতীর মত একটা বিরাট জীবের ওজন করা হবে শুধু একটা নৌকো আর খান কতক ইটের সাহায্যে! নিক্তি নেই, ওজন নেই—এ যে কি ক'রে হ'তে পারে সবাই তা' নিয়ে মহা জল্পনা-কল্পনা সুরু করলে।

অবশেষে সব জল্পনা-কল্পনার শেষ হ'ল। একটা প্রকাণ্ড কালো ঘোড়ায় চ'ড়ে খান্ লো ধীরে ধীরে নদীর ঘাটে উপস্থিত হ'ল। তার দু'পাশে দু'জন দেহরক্ষী, পেছনে সেই হাতীটি।

খান্ লো এসেই হুকুম দিলে, হাতীটাকে নৌকোর ওপর

তোলা হোক্! অনেক কায়দা কানুন, অনেক ধস্তাধস্তি ক'রে ত' সে-কাজ সমাপ্ত হ'ল।

হাতীর ভারে নৌকোর কাঠ যতটুকু অবধি জলে ডুব্‌ল, খান্ লো খুব সাবধানে সেখানে একটা দাগ কেটে দিলে।
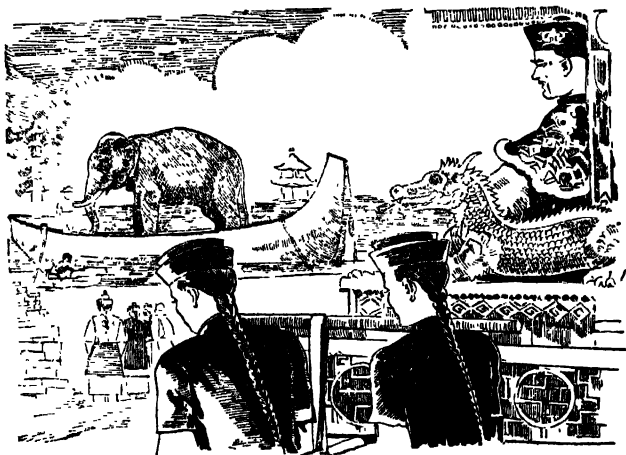
তারপর হাতীকে নৌকো থেকে নাবানো হ'ল। সেও কি সহজ কাজ!

এবার খান্ লো হুকুম দিলে—গুণে গুণে নৌকোয় ইট বোঝাই করা হোক্!

যারা তামাসা দেখতে এসেছিল, তারা খান্ লোর এই কাণ্ড

দেখে বলাবলি সুরু করলে—"হাতীর ওজন বা'র করবে, না কচু করবে। আসলে ছেলেটার মাথাই খারাপ হয়েছে।"

খান্ লো অবশ্য কারও কোন .কথায়ই কান দিলে না। তার চোখ শুধু সেই দাগের ওপর। শেষে ইটের ভারে নৌকোটি যখন সেই দাগ অবধি ডুবে গেল, তখন মজুরদের থামতে হুকুম ক'রে বল্লে—"হাতীর ওজন বা'র হয়ে গেল সম্রাট্!"

ওজন বা'র হয়ে গেল! ছোক্‌রা বলে কি!···সম্রাটের মত সবাই খান্ লোর মুখের দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে রইল। তারা কেউ এ হেঁয়ালির কোন মানেই বুঝে উঠতে পারলে না।

খান্ লো বিজয়ী বীরের মত সম্রাটের সুমুখে উপস্থিত হয়ে বল্লে—"ব্যাপারটা খুবই সহজ সম্রাট্! আপনি হয়ত লক্ষ্য ক'রেছেন, হাতীটাকে নৌকোয় তুললে নৌকোটি যতটা অবধি জলে ডুবেছিল, আমি সেখানে একটা দাগ দিয়েছি! তারপর হাতীটাকে নাবিয়ে এমনভাবে ইট বোঝাই করেছি যাতে নৌকোটি ঠিক আগের দাগ অবধি ডুবে যায়। এতেই বোঝা যায় হাতীর আর ইটের ওজন সমান। ইটগুলো সবই সমান ওজনের, ক'খানা ইট বোঝাই হয়েছে সে আমি বোঝাই করবার সাথে সাথেই গুণে গেছি, কাজেই ইটের সংখ্যা দিয়ে একটা ইটের ওজনকে গুণ করলেই হাতীর ওজন বেরিয়ে যাবে।"

মিনিট খানেক থেমে খান্ লো আবার বল্লে—"ইটগুলো

সমান ওজনের না হ'লেও কোন ক্ষতি হ'ত না। সেগুলোকে এক একখানা ক'রে ওজন করতে হ'ত।"

বিস্মিত সম্রাট্ আনন্দে খান্ লো-কে বুকে তুলে নিয়ে বল্লেন—"ধন্য তোমার বুদ্ধি! তোমার মত ছেলে যে দেশে জন্মায়, সেখানকার স্বাধীনতা হরণ করা সত্যি শোভা পায় না। এমনি ভাবেই তোমার বুদ্ধির গৌরবে তোমার দেশের মুখ উজ্জ্বল করো, তোমাকে এই আশীর্ব্বাদ করছি।"

বলেই তিনি তাঁর গলা থেকে মহামূল্য মণি-হার খুলে খান্ লোর গলায় পরিয়ে দিলেন।

দর্শকদের মধ্যে আনন্দধ্বনি উঠ্‌ল।

এমনি ক'রে একটি বারো বছরের ছেলে শুধু বুদ্ধির জোরে স্বদেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখলে!

* * *

তিন হাজার বছর আগে চীন সম্রাটের মনে যে প্রশ্ন জাগেনি, তোমাদের মনে হয়ত সে প্রশ্ন উঠতে পারে।

প্রশ্নটি এই। ছু'বারই নৌকোটি একই দাগ অবধি জলে ডুবলো বলে' হাতী আর ইটের ওজন সমান হবে কেন?

এ প্রশ্নের মীমাংসা করেছিলেন আর্কিমিডিস্ নামে সিরাকিউজের একজন বৈজ্ঞানিক। সেও আর এক চমৎকার গল্প।

দুই হাজার বছরেরও আগের কথা।

সিসিলী দ্বীপের সিরাকিউজ্ নগরে হিরো নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। রাজার রাজ্য যে খুব বড় তা' নয়, কিন্তু তবুও তাঁর লোক লস্কর, সেপাই সৈন্য, হীরা জহরত, ধন ঐশ্বর্য্য নেহাৎ কম ছিল না।

রাজার মাথায় একদিন খেয়াল চাপল, তিনি এমন একটি রাজমুকুট পরবেন, যা' পৃথিবীর অন্য কোন রাজারই নেই। তার কারুকার্য্য হবে অতুলনীয়, তার দাম হবে অন্য সব মুকুটের চেয়ে অনেক বেশী!

রাজার ইচ্ছার কথা জেনে রাজ্যের সেকরা মহলে সাড়া প'ড়ে গেল। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই, কেউ সাহস ক'রে রাজার

মুকুট তৈরী করতে ভরসা পেল না। সবারই ভয়, যদি মুকুট রাজার মনোমত না হয় তবে কাঁধের ওপর মাথা কি আর আস্ত থাকবে! অথচ এমন মুকুট তৈরী করাও সোজা কথা নয়!—যা' কেউ কোন দিন করেনি, যা' কেউ কোন দিন সহজে করতে পারবে না।

সেকরাদের এই আম্‌তা আম্‌তা ভাব দেখে রাজার জেদ আরও বেড়ে গেল। দেশে কি এমন একজন কারিকরও নেই, যে একটা মুকুট তৈরী করতে পারে!

তিনি মন্ত্রীকে আদেশ দিলেন—"যেমন ক'রেই হোক্ শিল্পী কারিকরের সন্ধান করো! মুকুট আমার চাই-ই!"

অবশেষে এক নামকরা শিল্পী সাহস ক'রে রাজসভায় এসে রাজাকে তার অভিবাদন জানালে। সভার সবাই অবাক্ হয়ে এই দুঃসাহসী লোকটিকে একবার দেখে নিলে।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন—"আমি যেমনটি চাই, পারবে ত'? আমি চাই এমন একটি মুকুট যার কারুকার্য্যের কাছে পৃথিবীর সব মুকুট হার মানবে, যার চাকচিক্যে আর সব মুকুট মলিন হবে। পারবে ত' ঠিক তেমনটি ক'রে দিতে?"

সেকরা রাজাকে আর একবার নমস্কার জানিয়ে সবিনয়ে বল্লে—"আপনার আদেশ পেলেই একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি, মহারাজ! যদি পারি, সে আপনার আশীর্ব্বাদ।"

রাজা খুসী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—"মুকুট তৈরী করতে তোমার ক'দিন লাগবে ?"

—"এক সপ্তাহ সময় চাই, মহারাজ।"

—"বেশ, এক সপ্তাহ সময়ই তোমায় দিলাম। কিন্তু ঠিক সাতদিন পর মুকুটটি চাই-ই, এ কথাটি যেন ভুলো না।···হ্যাঁ, তারপর! কতখানি সোনা চাই তোমার ?"

সেকরা হিসাব ক'রে সোনার পরিমাণ বলতেই, রাজা হুকুম দিলেন, যা' সোনার দরকার, তা' যেন রাজকোষ থেকে দেওয়া হয়।

সেকরা সোনা নিয়ে বিদায় হ'ল।

এক সপ্তাহ পরের কথা।

রাজসভায় এসেই রাজা সবার আগে ডাকলেন সেকরাকে।

বেচারা কাঁপতে কাঁপতে রাজসভায় এসে হাজির হ'ল। তার কাঁপুনি দেখে সবাই ভাবলে, মুকুট বোধ হয় তেমন সুন্দর হয় নি, তাই এত ভয়!

কিন্তু রাজার আদেশে নূতন তৈরী মুকুটটি সামনে খুলে ধরতেই সবাই সবিস্ময়ে দেখলে, কি চমৎকার তার কাজ, কি সুন্দর তার গড়ন! উজ্জ্বল রাজসভা যেন মুকুটের শোভায় আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল!

রাজার মুখও হাসির আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হ্যাঁ, যেমনটি চেয়েছিলেন, ঠিক তেমনটিই হয়েছে! বাহাদুর শিল্পী বটে! সভাসদ্‌গণ সকলে ধন্য ধন্য করতে লাগলেন।

রাজা তাঁর গলা থেকে মণি-হার খুলে সেকরাকে দেবার জন্য সিংহাসন ছেড়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু তার মুখের দিকে নজর পড়তেই তিনি চম্‌কে উঠলেন। তাঁর মনে যেন কেমন একটা খট্‌কা বাজল!

এমন চমৎকার মুকুট! সবাই এজন্য তাকে শতমুখে প্রশংসা করছে, রাজা নিজ হাতে তার গলায় হার পরাতে যাচ্ছেন, অথচ তার মুখে যেন কেমন একটা ভয়ের ছায়া! এর অর্থ কি?

তবে? তবে কি এ মুকুট খাঁটি সোনার নয়? সেকরা কি তবে লোভ সামলাতে না পেরে সোনার সাথে অন্য কোন সস্তা ধাতু মিশিয়েছে?

রাজা আবার সিংহাসনে বসে' পড়লেন। পুরস্কারের হার তাঁর হাতেই রইল, তা' আর সেকরার ভাগ্যে জুটল না।

রাজা মন্ত্রীর দিকে চেয়ে বল্লেন—"এ মুকুটটি যে সত্যিই খাঁটি সোনার, এর সাথে যে অন্য কোন খাদ মিশান হয় নি, তা' সঠিক জানবার কোন উপায় বা'র করতে পার?"

মন্ত্রী নিরুত্তরে মাথা চুলকোতে লাগলেন। রাজা একে

একে অন্য সভাসদ্‌গণের মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন, কিন্তু কারু মুখ দিয়েই কোন কথা বেরুল না।

শেষে একজন সভাসদ্ সাহস ক'রে আস্তে আস্তে বল্লেন—"মুকুটটি আগুনে গলিয়ে পরীক্ষা করা হোক্!"

পরীক্ষাটি খুবই সহজ। কিন্তু এমন সুন্দর জিনিষটি আগুনে গলিয়ে নষ্ট করতে রাজা রাজী হ'লেন না।

তখন ডাক পড়লো আর্কিমিডিসের। বৈজ্ঞানিক হিসাবে তাঁর তখন মস্ত খ্যাতি। রাজসভার হৈ-হট্টগোলের মাঝে না এসে তিনি তাঁর নিভৃত গৃহকোণে একা একা বসে' বিজ্ঞানের নানা জটিল সমস্যার সমাধান নিয়ে মেতে থাকতেন। সিরাকিউজের সকলেই এই আপনভোলা পণ্ডিত লোকটিকে দেবতার মত শ্রদ্ধা করত!

রাজার আহ্বানে রাজসভায় এসে হাজির হ'তেই রাজা আর্কিমিডিস্‌কে তাঁর সমস্যার কথা বল্লেন। কিন্তু এত বড় পণ্ডিতও তখন তখনই কোন জবাব দিতে পারলেন না।

মিনিট খানেক চুপ ক'রে থেকে তিনি রাজাকে বল্লেন—"তিন দিন সময় চাই, মহারাজ!"

রাজা জানতেন, আর্কিমিডিস্ তাঁর মাথা খাটিয়ে একটা না একটা উপায় বা'র করতে পারবেনই।

তাই তিনি বল্লেন—"বেশ তিন দিন পরই পরীক্ষা হবে।"

তখনকার মত সেকরাকে বিনা পুরস্কারেই বিদায় দেওয়া হ'ল।

এদিকে আর্কিমিডিস্ দিন-রাত শুধু এ সমস্যার কথাই ভাবছেন। কিন্তু ভেবে ভেবেও কোন কূলকিনারা পাচ্ছেন না।

দেখতে দেখতে দু'দিন কেটে গেল। হাতে রইল মাত্র আর একটি দিন। এরই মধ্যে যেমন ক'রেই হোক্, একটা উপায় বা'র করতেই হবে।

এ দু'দিন আর আর্কিমিডিসের নাওয়া-খাওয়া ছিল না। আজ কি মনে ক'রে তিনি নাইতে গেলেন।

স্নানের চৌবাচ্চাটি ছিল একেবারে কানায়-কানায় জল-ভর্ত্তি। আর্কিমিডিস্ নাবতেই অনেকটা জল চৌবাচ্চার চার ধার উপচিয়ে বাইরে গড়িয়ে পড়ল।

এমনি আরও অনেক দিনই হয়েছে। কিন্তু আজকের মত এমন ক'রে এ জিনিষটি তাঁর নজরে পড়ে নি। আজকের এই অতি সামান্য একটি ঘটনায়ই তাঁর চোখের দৃষ্টি একেবারে খুলে গেল! যে সমস্যা নিয়ে আজ তিন দিন ধ'রে মাথা ঘামাচ্ছেন, এই তুচ্ছ ঘটনার মধ্যেই তিনি তার সমাধান পেলেন।

সাফল্যের আনন্দে আর্কিমিডিসের ছু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কোথায় রইল তাঁর স্নান! কাপড়-চোপড় ছেড়ে তিনি চৌবাচ্চায় নাইতে নেবেছিলেন, সে অবস্থায়ই তিনি ছুটে' রাজার কাছে চললেন। অন্য কোন দিকে তাঁর দৃষ্টি

নেই, উলঙ্গ বলে' তাঁর তখন লজ্জার বালাই নেই। চোখে একটা অসাধারণ দীপ্তি আর মুখে শুধু একটি কথা—"ইউরেকা' —'ইউরেকা' (Euraka)—'আমি পেয়েছি, আমি পেয়েছি!"

রাজা আর্কিমিডিসের এই উন্মত্ত ভাব আর তাঁর মুখের কথা শুনেই বুঝতে পারলেন, বৈজ্ঞানিক তাঁর সমস্যার সন্ধান পেয়েছেন।

তাই তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—"তুমি কি পেয়েছ আর্কিমিডিস্ ?"

মার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারলে শিশুর মুখ-চোখ যেমন হাসিতে ঝল্‌মল্ ক'রে উঠে, বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিকের মুখেও তেমনি হাসির বিজুলি খেলে গেল।

তিনি বল্লেন—"আমি আপনার সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছি, মহারাজ! সবার সামনেই তা' দেখাব।"

সভাশুদ্ধ সকলের চোখ মুখে সে কি ঔৎসুক্য!

আর্কিমিডিস্ প্রথমে একটা নিক্তি নিয়ে মুকুটটাকে ওজন করলেন। মুকুটের ওজন বা'র হয়ে গেলে তিনি সমান ওজনের একতাল খাঁটি সোনা নিলেন।

এইবার একটা বড় গামলা কাণায় কাণায় জল-ভর্ত্তি ক'রে মুকুটটি তাতে ডুবিয়ে দেওয়া হ'ল এবং গামলার ধার উপচিয়ে যতটুকু জল পড়ল, আর্কিমিডিস্ তা' একটা বাটিতে ধ'রে তার ওজন টুকে নিলেন।

গামলাটি আবার জল-ভর্ত্তি ক'রে সোনার তালটি তাতে ফেলে দেওয়া হ'ল। আবার কতকটা জল উপচিয়ে পড়ল। আর্কিমিডিস্ আবার তা' ওজন করলেন।

দেখা গেল এবারকার উপচে পড়া জলের ওজন আগেকার চেয়ে অনেক কম।

আর্কিমিডিস্ রায় দিলেন—মুকুটটি দেখতে যত সুন্দরই হোক্, খাঁটি সোনার নয়। সেকরা উহাতে সস্তা অন্য কোন ধাতুর খাদ মিশিয়েছে।

ব্যাপারটা রাজার নিকট পরিষ্কার হ'ল না। তাই তিনি আর্কিমিডিসের কাছে তার কারণ জানতে চাইলেন।

আর্কিমিডিস্ যে ভাবে রাজাকে সমস্ত ব্যাপারটি বুঝিয়ে বল্লেন, তার সার কথা হচ্ছে এই :—মুকুটটি জলে ফেলা মাত্র কতকটা জল উপচে পড়ল। কতটা পড়ল ?—না, মুকুটের যা আয়তন, ঠিক ততটুকু। খানিকটা জল সরিয়ে মুকুটটি যেন তার যায়গা দখল ক'রে বসেছে!

তারপর সোনার তালটি জলে ডুবালে যে পরিমাণ জল উপচে পড়ছে তার আয়তনও ঠিক সোনার তালের আয়তনের সমান।

এদিকে সোনার তাল আর মুকুটের ওজন এক। কাজেই এ দু'টি যদি ঠিক একই জিনিষ হ'ত অর্থাৎ মুকুটটি যদি ঠিক খাঁটি সোনার হ'ত তা' হ'লে দু'বারের উপচে পড়া জলের আয়তন অর্থাৎ ওজন ঠিক একই হ'ত!

কিন্তু তা' ত হ'ল না। দেখা গেল, মুকুটটি জলে ডুবানোর ফলে যে জল উপচে পড়েছে তার ওজন দ্বিতীয় বারের উপচে পড়া জলের চেয়ে বেশী।

তার মানে মুকুটের আয়তন সোনার তালের আয়তনের চেয়ে বেশী। অথচ দু'টির ওজনই যখন এক, তখন মুকুটে এমন কোন ধাতু মেশান হয়েছে, যার ওজন সোনার ওজনের চেয়ে কম। রূপা সোনার চেয়ে হাল্‌কা। কাজেই সেকরা হয়ত লোভে প'ড়ে রূপা মিশিয়েছে।

অমনি ডাক পড়ল সেকরার। পাপীর মন! বেচারা বলির পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে রাজসভায় এসে রাজার পা জড়িয়ে ধরল। আর্কিমিডিসের পরীক্ষার কথা সে পথেই শুনতে পেয়েছিল।

বেচারা ভয়ে ভয়ে নিজের অপরাধ স্বীকার করলে। সত্যিই সে মুকুটে সোনার সাথে রূপা মিশিয়েছে।

বেচারা কি আর জানত যে, তাকে জব্দ করবার জন্য দেশে এমন একজন মাথাওয়ালা লোক ছিল!

অতি লোভের ফলে সেকরার মজুরি মিলল, শ্রীঘর।

এই চুরি ধরেই যে আর্কিমিডিস্ চুপটি ক'রে বসে রইলেন তা' নয়। তিনি তেল, জল প্রভৃতি বিভিন্ন তরল পদার্থের মধ্যে নানা ওজনের জিনিষ ডুবিয়ে নিত্য নূতন পরীক্ষা করতে লাগলেন।

তাঁর সে সব পরীক্ষার ফল বিজ্ঞান জগতে অমর হয়ে

রয়েছে এবং চিরদিনই তা' থাকবে। আমরা সংক্ষেপে তোমাদিগকে তার একটু আভাষ দিচ্ছি।

একটা জলভরা কলসী এমনি দু'হাত জায়গা বয়ে নিতে কি কষ্ট হয়! কিন্তু প্রকাণ্ড ঘড়াকে জলে ডুবিয়ে পুকুরের এক পাশ থেকে অনায়াসেই আর এক পাশে নেওয়া যায়। কেন? এর কারণ কি?

আর্কিমিডিস্ বল্লেন, কোন জিনিষ যখন জলে বা অন্য কোন তরল পদার্থে ডুবান যায়, তখন মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের ফলে তা' তলিয়ে পড়তে চায়; কিন্তু সেই সাথেই আবার তরল জিনিষটি তাকে ঠেলে উপরের দিকে তুলে দিতে চায়!

এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির ফল এই হয় যে, জল বা অন্য কোন তরল পদার্থে কোন জিনিষ ডুবালে তার ওজন কমে যায়। কতটা কমে? না, জিনিষটির যা আয়তন, সেই আয়তনের তরল পদার্থটির যা ওজন, ঠিক ততটুকু কমবে।

যে জিনিষ জলের চেয়ে হাল্‌কা তা' জলে ভাসবে। কিন্তু সে-ক্ষেত্রে হাল্‌কা জিনিষটির যা' ওজন ঠিক ততটুকু জল স্থানচ্যুত হবে। কথাটা একটু শক্ত হয়ে গেল। একটা উদাহরণ দিয়ে বললে বোধ হয় বুঝতে সুবিধা হবে।

একটা মেজার গ্লাসের একটা নির্দ্দিষ্ট দাগ অবধি জলে ভর্ত্তি কর। তারপর তার মধ্যে এমন এক টুকরো কাঠ ফেলে দাও

যাতে জলের মাথা এক আউন্স বা আধ আউন্স উপরে উঠে যায়। এখন সেই এক আউন্স বা আধ আউন্স জলের ওজন করলে দেখবে, জলের ওজন আর সেই শুক্‌নো কাঠটির ওজন এক।

আর্কিমিডিস্ সকলের আগে প্রকৃতির এই নিয়মটির সন্ধান পেয়ে সকলের কাছে প্রচার করেছিলেন বলে' এটি তাঁর নামের সাথে যুক্ত হয়ে 'আর্কিমিডিসের নিয়ম' বলে' খ্যাতি লাভ করেছে।

এবার আগের সেই হাতীর গল্পে যাওয়া যাক্। দু'বারই নৌকোটি একই দাগ অবধি জলে ডুবেছিল। তার মানে, দু'বারেই একই পরিমাণ জল স্থানচ্যুত হয়েছিল। কাজেই সেই স্থানচ্যুত জলের ওজন দু'বারেই একই হবে। ফলে হাতীর ওজন আর ইটের ওজন ঠিক সমানই হবে।

আজ আমরা ভাসা ডুবার কারণ জানি, কোন্ জিনিষ কোন্ জিনিষের চেয়ে কতগুণ ভারী বা হাল্‌কা তা' সহজেই বা'র করতে পারি, এমনি আরও অনেক কিছুই আজ আমাদের কাছে আর তেমন শক্ত নয়। কিন্তু এ সবার মূলেই রয়েছে আর্কিমিডিসের এই আবিষ্কার। আর তারও মূলে রয়েছে সিরাকিউজের সেই জুয়াচোর সেকরার জুয়াচুরি!
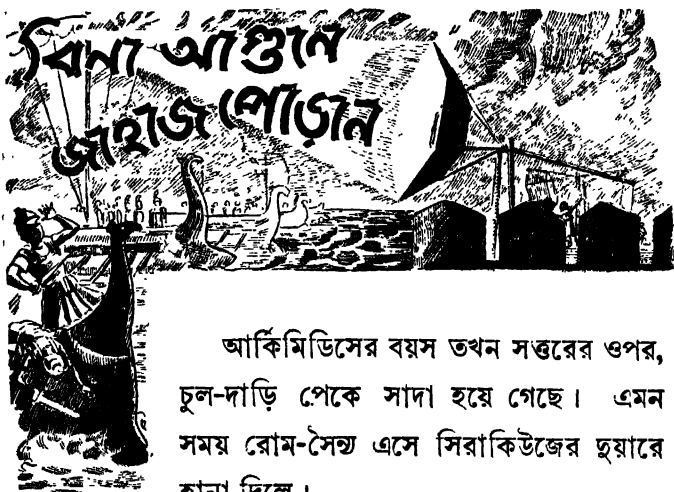
আর্কিমিডিসের বয়স তখন সত্তরের ওপর, চুল-দাড়ি পেকে সাদা হয়ে গেছে। এমন সময় রোম-সৈন্য এসে সিরাকিউজের দুয়ারে হানা দিলে।

রোম তখন খুবই শক্তিশালী রাজ্য। তার অগুণতি সৈন্য-সামন্ত, বড় বড় যুদ্ধজাহাজ। তার তুলনায় সিরাকিউজ—সে আর কত টুকুন্। ছোট্ট রাজ্য, তার লোকজনও সেই অনুপাতে নিতান্তই অল্প।

তাই সিরাকিউজের লোকেরা যখন জানতে পারলে যে, রোম থেকে জাহাজ বোঝাই ক'রে বহু সৈন্য সিরাকিউজ দখল করতে আসছে, তখন তা'রা ভয় পেয়ে আর্কিমিডিসের কাছে এসে কেঁদে পড়ল।

বুড়া বৈজ্ঞানিক তখন আপন মনে অঙ্কের সমস্যার সমাধান করছিলেন, তাঁর আশে পাশে কি হচ্ছে না হচ্ছে, তার খোঁজ-খবরই রাখতেন না। সিরাকিউজের লোকদের কান্না শুনে তাঁর সে ধ্যান ভাঙল। অল্প শক্তি নিয়েই কি ক'রে রোম-সৈন্যদের হঠানো যায় তিনি তাই ভাবতে লাগলেন। আর্কিমিডিসের মাথা !—কিছুক্ষণের মধ্যেই সে মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল, আর মুখে ফুটল সাফল্যের হাসি।

তিনি যখন জানতে পারলেন, রোমের সৈন্যরা জাহাজে ক'রে আসছে তখন মনে মনে মতলব করলেন যে, জাহাজগুলো পোড়াবার ব্যবস্থা করবেন।

তখনকার দিনের জাহাজ আজকালকার মত ইস্পাতে তৈরী হ'ত না। সেগুলো ছিল কাঠের; দাঁড় এবং পালের সাহায্যে তা' চলত। কাজেই সেগুলো পোড়ানও ছিল আজকালের জাহাজের চাইতে অনেক সহজ।

তোমরা জান যে, একটা আয়নাকে সূর্য্যের দিকে ধরলে সূর্য্যের আলো আয়না থেকে ঠিকরে পড়ে। সহরের ছেলেরা অনেক সময় এ উপায়ে এক বাড়ী থেকে আর এক বাড়ীর ছেলের মুখের ওপর সূর্য্যের আলো ঠিক্‌রে ফেলে তাকে নাকাল করতে চেষ্টা করে। এখন আয়নাটা যদি সাধারণ আয়নার মত সমতল না হ'য়ে অবতল (concave) হয়, তা' হ'লে, ঠিক একটা

জায়গায় সূর্য্যের সব আলো ঠিক্‌রে পড়ে, আর সে আলোর তেজ এত বেশী হয় যে, সেখানে যে জিনিস থাকবে তা'ই জ্বলে' একেবারে ছাই হ'য়ে যাবে।

আর্কিমিডিস্ একথাটা জানতেন, তাই এভাবেই রোমের সৈন্যদের দর্প চূর্ণ করবার মতলব করলেন। তিনি নানা সাইজের অনেকগুলো আয়না নিয়ে সেগুলো এমন ক'রে সাজালেন যাতে সূর্য্যের আলো ঠিক্‌রে যেয়ে ঠিক একটা জায়গার ওপর পড়ে। এভাবে আয়নার অস্ত্র তৈরী ক'রে তিনি রোমের জাহাজের জন্য সমুদ্রতীরে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

কিছুদিন বাদেই সারি সারি যুদ্ধজাহাজ দেখা দিল; সব ক'টিই রোম-সৈন্যে একেবারে ভর্ত্তি। সিরাকিউজ দখল! সে ত পাঁচ মিনিটের কাজ!—এইরূপ একটা অবজ্ঞার মনোভাব নিয়েই সেনাদল নিশ্চিন্তমনে আসছিল। তখন কি আর তা'রা জানত, সিরাকিউজে এমন একটি মাথা আছে—যার বুদ্ধির ধার রোমের সব সৈন্যের তলোয়ারের ধারের চেয়েও অনেক বেশী!

এদিকে আর্কিমিডিস্ যখন দেখলেন যে, জাহাজগুলো তাঁর আয়না-অস্ত্রের সীমানার মধ্যে এসে পড়েছে, তখন আয়না ক'টি ঠিকমত ঘুরিয়ে দিলেন। ব্যস্!—সমুদ্রের বুকে সব কয়টি জাহাজে দাউ-দাউ ক'রে আগুন জ্বলে' উঠল। সে আগুন যে

কোথেকে এল তা' জানবার আগেই জাহাজ ক'টি পুড়ে' একেবারে ছাই হয়ে গেল। রোমের দর্প চূর্ণ হ'ল।

কিন্তু এত ক'রেও আর্কিমিডিস্ সিরাকিউজকে রোমের নিকট পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচাতে পারলেন না। তবে সে পরাজয় তাঁকে নিজের চোখে দেখে যেতে হয় নি।

একজন সৈন্য আর্কিমিডিসের ঘরে ঢুকে তাঁকে শেষ করল

রোম-সৈন্যদের সেনাপতি ছিলেন মার্সেলাস্। তিনি জয়-লাভের অন্য কোন উপায় না দেখে সিরাকিউজ অবরোধ ক'রে রইলেন। মাসের পর মাস এভাবেই চলল। শেষে এক

বিশ্বাসঘাতকের চক্রান্তে মার্সেলাস্ রাতের আঁধারে সিরাকিউজ দখল ক'রে ভেতরে প্রবেশ করলেন।

এ বিশ্বাসঘাতকতার জন্য সিরাকিউজের লোকেরা একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। তাই তা'রা আর বাধা দিতে পারলে না। বিজয়ী রোম-সৈন্যরা নগরে ঢুকে নানা-রকম অত্যাচার সুরু করল; যাকে সামনে পেল, তাকেই হত্যা করতে লাগল। একজন সৈন্য আর্কিমিডিসের ঘরে ঢুকে তাঁকেও শেষ করল। বেচারা জানতেও পারল না, জগতের কি সর্ব্বনাশ করল!

আর্কিমিডিস্ তখন তাঁর ঘরে ব'সে একমনে একটা জটিল অঙ্কের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, এমন সময় অতর্কিতে শত্রুসৈন্যের তলোয়ার এসে তাঁর বুকে বিঁধল। আর সেই আঘাতেই তাঁর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটল।

আর্কিমিডিস্ নেই, কিন্তু তাঁর নাম আজও অমর হয়ে আছে, চিরকালই থাকবে।

বাতাস নিয়ে খেলা

চৈত্র-পূর্ণিমার ধব্ধবে জ্যোৎস্নায় সারা পৃথিবী ছেয়ে গেছে, রজনীগন্ধার ব্যাকুল গন্ধে আকাশ বাতাস পাগল হয়ে উঠ্ছে, এমন সময় রাজপুরীতে মঙ্গল-শঙ্খ বেজে উঠ্ল—রাজার ঘর-আলো-করা এক ছেলে হয়েছে! নিঃসন্তান রাজারাণীর বহুদিনের কামনার ধন ছেলে! হাজার হাজার প্রজার আকুল আকাঙ্ক্ষার ধন রাজকুমার!

ছেলে ত' নয়, যেন স্বর্গ থেকে খসে আসা এক টুকরা চাঁদের হাসি! মাখনের মত তুল্তুলে, কনকচাঁপার মত রঙ্। রাজকুমার হাসে—মনে হয় মাণিক ঝরে; যদি কেঁদে উঠে, মনে হয় মুক্তা গড়িয়ে পড়ছে! রাজারাণীর আনন্দ রাখবার ঠাঁই নেই। রাজ্য জুড়ে উৎসবের আর শেষ নেই!

এমনি আদর আব্দারের মধ্যে রাজপুত্রের পাঁচ বৎসর কেটে

গেল। রাজা শুভদিন দেখে রাজ্যের সেরা পণ্ডিত দিয়ে তার হাতেখড়ি দিলেন। কিন্তু ছ'মাস যেতে না যেতেই দেখা গেল রাজকুমারের পড়াশুনায় যা' মন, তার হাজার গুণ উৎসাহ তার ধনুক ছোঁড়ায়! পাঁচ বৎসরের ছেলে। এরই মধ্যে তার লক্ষ্যভেদের আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখে সবাই অবাক্ হ'তে লাগলো।

শেষে এই ধনুক ছোঁড়াই হ'ল তার কাল! মন্ত্রীর ছেলে, উজিরের ছেলে, সেনাপতির ছেলে, সবাইকে ডেকে কুমার একদিন তার তীর ছোঁড়ার কায়দা দেখাচ্ছে, এমন সময় একটা তীর হঠাৎ বেফাঁস ছুটে' গিয়ে বিঁধল ত বিঁধল একেবারে এক বামুনের ছেলের চোখে। তীর ত' নয়—আগুনের ফুল্‌কি! ছেলেটি তখন সবে মাত্র খাবারের থালাটি সুমুখে নিয়ে বসেছে! খাওয়া চুলোয় গেল—তার চোখ দিয়ে ছুট্‌ল কাঁচা রক্তের ধারা! চোখটি তার জন্মের মতই গেল!

বামুনের এই একটিই ছেলে। ছেলে ত নয়—নয়নের মণি! হয়ত তার চেয়েও বেশী। বামুন মনের দুঃখে অভিশাপ দিলেন,—যে আমার ছেলের এমন দশা করেছে, সে যে-ই হোক্, যেখানেই থাকুক, যখন যে জিনিষে হাত দেবে, তা' তক্ষুণি হয়ে যাবে নিরেট পাথর।

সে কালের বামুনের বাক্যি, না বেদ বাক্যি! রাজারাণী

শুনে একেবারে থ' খেয়ে গেলেন! রাজ্য জুড়ে আবার হাহাকার উঠ্‌ল! রাজকুমার যাতে হাত দেয় তাই হয়ে যায় একেবারে পাথর, ঝান্নু। কুমারের খাওয়া-দাওয়া ঘুচ্‌ল, বেশ-ভূষা করার আর উপায় রইল না। এখন উপায়? মন্ত্রী মাথায় হাত দিয়ে শুক্‌নো মুখে ভাব্‌তে বসলেন।······

আষাঢ়ের বাদল-ঘন রাতে গল্প শুন্‌তে শুন্‌তে ঠাকুরমার কোল ঘেঁসে রুদ্ধ নিশ্বাসে প্রশ্ন করতাম—তারপর?···না খেয়ে খেয়ে রাজকুমার ক'দিন বাঁচ্‌বে ঠাকুরমা?···তারপর কি হ'ল?

আর ঠাকুরমা! কোন্ ফাঁকে তাঁর দু' চোখ এক হয়ে গেছে। তাই বাকীটা আর সেদিন শোনা হয় নি।···

তোমরাও না হয় বাকীটা আর একদিন শুন্‌বে। এখন যদি এমন একটা ম্যাজিক্ শিখিয়ে দেওয়া যায়—যাতে শাপ মন্যি না দিয়েও তোমরাই আঙুর, কলা, মাংস, ফুল এমনি সব নরম জিনিষকে একদম পাথর ক'রে ফেলতে পার, তা' হ'লে কেমন মজা হয়? আবার যদি সেই পাথরগুলিকে ইচ্ছে করলেই আগেকার মতনই বেমালুম আঙুর, কলা, মাংস, ফুল —যা যেমনটি ছিল ঠিক তেমনটি করতে পার, তা' হ'লে ত' আরো মজা! নয় কি?

তোমরা হয়ত অবাক্ হয়ে ভাব্ছ—এ'ত আর সেই মুনি-ঋষিদের সত্যিযুগ নয়, বা ডাইনী বুড়ীদের রাজত্বও নয় যে, মুখ থেকে যা বেরুল অমনি তা' হয়ে যাবে। যা অসম্ভব, এ যুগে তা' কি ক'রে সম্ভব হবে? এ মুনি-ঋষি বা ডাইনী বুড়ীর যুগ নয় বটে, কিন্তু এটা যার যুগ সে বিজ্ঞান দেবতাটি এমনি মায়াবী যে, তার মায়াস্পর্শে অসম্ভবও সম্ভব হ'তে বেশী দেরী হয় না।

সত্যি সত্যি রসে টুসটুসে আঙুর বা তোমার সাধের গোলাপ ফুলটিকে অনায়াসে পাথর ক'রে ফেল্তে পার। কেমন ক'রে, তা' জানতে নিশ্চয়ই ইচ্ছে হচ্ছে! শোন বল্ছি।

ব্যাপারটা আর কিছু নয়—শুধু গলানো বাতাসের খেলা। বাতাসকে আবার গলানো যায়? তোমাদের কানে হয়ত কথাটা কেমন বাজ্বে। চাই কি কেউ হয়ত কথাটাকে নিছক পাগলের প্রলাপ বলেই উড়িয়ে দেবে! কিন্তু এটা মোটেই হাসির কথাও নয়, গাঁজাখুরিও নয়!

যে বাতাসকে আমরা দেখতে পাইনে এবং অদৃশ্য বলেই জানতাম, বিজ্ঞান যে তাকে ধ'রে তার পরীক্ষাগারের খাঁচায় পুরেছে তা' নয়, তাকে জোর চাপে ঠাণ্ডা ক'রে একবারে জলের মত করতে সমর্থ হয়েছে। ইচ্ছে করলে এই গলানো বাতাসকে আমরা এখন জলের মতই এক গ্লাস থেকে আর এক গ্লাসে ঢালাঢালি করতে পারি। শুধু তাই নয়, একে আবার জমিয়ে

শক্তও করা হয়েছে। যে বাতাস এমনি সারা আকাশে অদৃশ্য-ভাবে ভেসে বেড়ায়, তাকে জমিয়ে ফেললে সেই জমানো বাতাসের রং খানিকটে নীল হয়ে যায়। কাজেই বাতাস আজকাল আর সম্পূর্ণ অদৃশ্য নয়, রীতিমত দৃশ্য; আর একে ধরাও যায়, ছোঁয়াও যায়।

এই যে দুরন্ত বাতাস—সব চেয়ে দুষ্টু ছেলের চাইতেও যে লক্ষ গুণ বেশী দুষ্টু, এক মুহূর্ত্ত চুপ ক'রে থাকা যার কোষ্ঠিতে লেখা নেই, তাকে এমন ক'রে বন্দী করা, গলিয়ে ফেলা বা জমিয়ে শক্ত করা, এসব যত সহজে বলা হ'ল, আসলে তার একটি কাজও তত সহজ নয়। যে সেয়ানা দেবতাটি রুদ্র মূর্ত্তিতে মানুষের ঘরবাড়ী, দালান-কোঠা, গাছপালা মুহূর্ত্তে লণ্ডভণ্ড ক'রে তাণ্ডব সুরু করে, তাকে এমন ক'রে কায়দায় ফেলতে যে কত বৈজ্ঞানিকের কত শত-সহস্র বিনিদ্র রজনী যাপন করতে হয়েছে, রাতদিন ভূতের মত খাটতে হয়েছে, বড় হয়ে তার বিস্তৃত কাহিনী যখন পড়বে, তখন তোমার ঠাকুরমার সবচেয়ে মজার গল্পটিও এর কাছে হার মানবে। শুধু বাতাস নয়, বৈজ্ঞানিকগণ একে একে সব কয়টি গ্যাসকেই গলাতে ও জমাতে পেরেছেন! তবে এর প্রত্যেকটির পেছনে রয়েছে—তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম, গভীর অন্তর্দ্দৃষ্টি ও জীবন-ব্যাপী সাধনা।

বাতাস প্রভৃতি বায়বীয় পদার্থকে গলাতে বা জমাতে হ'লে বিশেষ ধরণের যন্ত্রপাতির দরকার। এসব যন্ত্রের প্রত্যেকটি খুটিনাটি অংশ এত জটিল যে, হাজার বর্ণনা দিলেও তা' বুঝে ওঠা তোমাদের পক্ষে এখন শক্ত হবে। কাজেই সে বর্ণনা না দেওয়াই ভাল।

তারপর গলানো হয়ে গেলেও এদের সাধারণ গ্রাস বাটিতে রাখা চলে না। আগেই বলেছি, প্রত্যেকটি বায়বীয় পদার্থেরই দুষ্টুমি স্বভাব একবারে মজ্জাগত। খোলা পাত্রে রাখলেই দুষ্টু বাতাস আবার অদৃশ্য হয়ে আকাশে উড়ে' পালাবে। তাই বৈজ্ঞানিকগণ গলানো বাতাসের এই দুষ্টুমি বন্ধ করার উপায়ও আবিষ্কার করেছেন।

তোমরা অনেকেই থারমো-ফ্লাস্ক দেখেছ। চা, দুধ গরম রাখবার বা জল, সরবৎ ইত্যাদি ঠাণ্ডা রাখবার জন্য হামেসাই এগুলির ব্যবহার হয়। একটা ভাঙা থারমো-ফ্লাস্ক একটু ভাল ক'রে লক্ষ্য করলে দেখবে, এই বোতলগুলির কাচের ডবল দেওয়াল আছে। দেওয়াল দুইটির মাঝের ফাঁকটুকু একেবারে বায়ুশূন্য ক'রে ফেলা হয় এবং ভিতরের দেওয়ালে রূপার প্রলেপ দেওয়া থাকে। এরূপ রূপার প্রলেপ দেওয়া এবং দুই দেওয়ালের মাঝের ফাঁকটুকু বায়ুশূন্য করার ফলে এসব বোতলে বহুক্ষণ অবধি গরম জিনিষ গরম, এবং ঠাণ্ডা

জিনিষ ঠাণ্ডা থাকে। গলানো গ্যাস্ রাখবার জন্য অধ্যাপক দেওয়ার সকলের আগে এ ধরণের ফ্লাস্ক বা বোতল আবিষ্কার করেছিলেন ব'লে তার নাম রাখা হয়েছে দেওয়ারের বোতল (Dewar's Flask)। দেওয়ারের বোতলে গলানো বাতাস রাখলে অনেক দিন অবধি তা' এক অবস্থায়ই থাকে।

একটা দেওয়ারের বোতলে খানিকটে গলানো বাতাস পেলেই আঙুর, কলা বা ফুলকে পাথর বানানো ছ'মিনিটের কাজ। বোতলের তরল বাতাসে আঙুর, কলা, ফুল, পেঁপে, মাংস, ভাত—যা-ই ফেল, চোখের নিমিষে তা' একেবারে নিরেট পাথর হয়ে যাবে। এত শক্ত হবে যে, কারও মাথায় ছুঁড়ে মারলে মাথা ফেটে দরদর ক'রে রক্ত ছুটবে। ইচ্ছে করলে তখন এই পাথুরে আঙুর বা পাথুরে ফুলকে শিলনোড়া দিয়ে বালির মত গুঁড়াও করা যায়!

কিন্তু বোতলের তরল বাতাস থেকে তুলে যদি এদের আবার অমনি খোলা বাতাসে কিছুক্ষণ রেখে দেওয়া যায়, তবে তক্ষুণি তাদের পাথর জন্ম ঘুচে যাবে। শ্রীরামচন্দ্রের পাদস্পর্শের আর কোন প্রয়োজনই হবে না। আঙুরটি তখন আবার রসে টুসটুসে হয়ে উঠবে, পাকা কলাটি আবার তুলতুল করতে থাকবে, ফুলটি আবার আগের মতই মিষ্টি হাসি হাস্‌বে!

বৈজ্ঞানিকগণ তরল বাতাস নিয়ে নানারকম পরীক্ষা ক'রে

গেছেন। তার মধ্যে সোজা কয়েকটা পরীক্ষার কথা এখানে বলা হ'ল। তোমরা যদি কোন দিন নিজ হাতে এসব পরীক্ষা করবার সুযোগ পাও, তা' হ'লে খুবই আমোদ পাবে।

খানিকটে জলভরা সরুগলার একটা কাচের পাত্রে কিছুটা তরল বাতাস ঢেলে দাও। দেখ্‌বে, তরল বাতাস অমনি টগ্‌বগ্‌ ক'রে ভীষণভাবে ফুটতে সুরু করবে এবং বাষ্প হয়ে হুস্‌ হুস্‌ ক'রে বেরিয়ে আসবে। সাথে সাথে পাত্রটির বাইরেটায় কুয়াসা জমে' জল গড়াতে থাকবে। কেন এমন হয় তা' বুঝতে হ'লে একটা কথা জানা দরকার।

জলের উত্তাপে তরল বাতাসের বাষ্প হওয়া

বায়বীয় পদার্থকে গলিয়ে তরল করলে তার উত্তাপ ভয়ানক কমে যায়। তোমরা বরফই সবচেয়ে ঠাণ্ডা বলে জান। এই বরফের উত্তাপ যদি শূন্য ডিগ্রী এবং ফুটন্ত বাষ্পের উত্তাপ যদি একশো ডিগ্রী হয়, তা' হ'লে গলানো গ্যাসের তাপ কমতে কমতে বরফের চেয়েও দু'শো আড়াইশো ডিগ্রী কম হবে! তা' হ'লেই ভেবে দেখ, গলানো গ্যাস কী ভীষণ ঠাণ্ডা! বরফের তুলনায় ফুটন্ত জল

যতখানি বেশী গরম, গলানো বাতাসের তুলনায় সাধারণ জল তার চেয়ে তিনগুণ বেশী গরম! একথাটি যদি মনে রাখো, তা' হ'লেই বুঝতে পারবে, উপরের পরীক্ষায় গলানো বাতাস জলে ঢালা মাত্র কেন তা' ফুট্‌তে সুরু করে।

উনানের উপর চাপানো খুব গরম কড়ায় যদি এক চামচ জল ঢেলে দাও তা' হ'লে কি হয় বল দেখি! দেখতে না
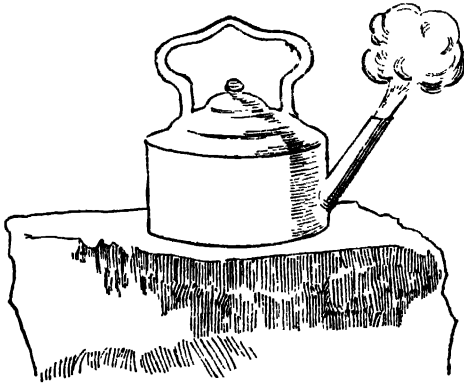
বরফের উত্তাপে তরল বাতাসের বাষ্প হওয়া

দেখতে জলটা টগ্‌বগ্‌ ক'রে একেবারে উবে যায়। জলের উপর তরল বাতাস ঢাললেও ঠিক তাই হয়। জল কেন, একখণ্ড বরফের উপর যদি গলানো বাতাস ভরা একটা কেট্‌লি রাখা যায়, তা'হলেও একই ফল হয়ে থাকে। কেট্‌লির ভেতর

তরল বাতাস টগ্‌বগ্‌ ক'রে ফুটতে সুরু করে এবং কেট্‌লির মুখ দিয়ে হুস্‌ হুস্‌ ক'রে বাতাসের বাষ্প বেরুতে থাকে। এর কারণও ঠিক আগের মতই। এ হু'টি সহজ পরীক্ষা থেকে অনায়াসেই বোঝা যায়, গলানো বাতাস কী ভীষণ ঠাণ্ডা!

এবার একটা এলুমিনিয়ামের সস্‌প্যান গলানো বাতাসে কয়েক মিনিট রেখে দাও। তুলে এনে দেখ, তা' কাচের মত পল্‌কা হয়ে গেছে। এ অবস্থায় হাত থেকে মেঝেতে পড়লে একেবারে কাচের মতই চূরমার হয়ে যাবে।

ছোট ছেলেদের খেলার রাবারের বল গলানো বাতাসে খানিকক্ষণ ফেলে রাখলে তারও এই একই অবস্থা হয়ে থাকে। তখন মেঝেতে এক আছাড় মারলেই কাচের মত ঝন্‌ ঝন্‌ ক'রে একশো টুক্‌রা হয়ে যায়।

গলানো বাতাসের সাহায্যে আরও একটা মজার জিনিষ তৈরী করা যায়। পারা তোমরা অনেকেই দেখে থাকবে। থার্ম্মোমিটারের ভেতরের চক্‌চকে সাদা জিনিষটি—যা জ্বরের সাথে সাথে ওঠা নামা করে তা'ই পারা। স্বাভাবিক অবস্থায় পারা তরল পদার্থ। কিন্তু পারার ওপর গলানো বাতাস ঢাললে তা' লোহার চেয়েও শক্ত হয়ে যায়। হাতুড়ী সাধারণতঃ লোহা দিয়ে তৈরী করা হয়। ছবিতে দেখ, লোহার বদলে পারা দিয়ে একটা হাতুড়ী তৈয়ার করা হয়েছে এবং তা' দিয়ে

কাঠের ওপর একটা পেরেক ঠুকা হচ্ছে। ভারী মজার নয় কি?

স্পিরিট তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ। টলটলে পাতলা, ষ্টোভ ধরাতে সর্ব্বদাই দরকার হয়। একটা গ্লাসে খানিকটে স্পিরিট নিয়ে তার ওপর যদি তরল বাতাস ঢেলে দাও, তবে
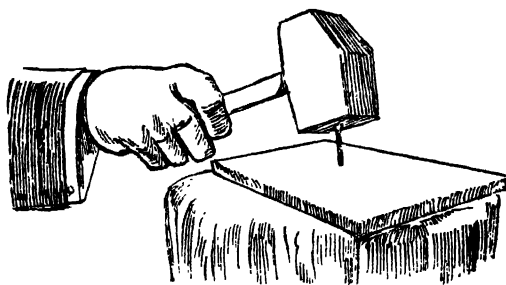
পারার হাতুড়ী

দেখতে দেখতে সমস্ত স্পিরিটটুকু জমে' একেবারে বরফের মত হয়ে যাবে। তখন সেই স্পিরিটের বরফকে একটা কাঠি দিয়ে অনায়াসেই গ্লাস থেকে তোলা চলে।

এবার লোহা বা তামার এমন একটা নল নাও, যার এক মুখ একেবারে বন্ধ। নলের মধ্যে খানিকটে গলানো বাতাস ঢেলে খোলা মুখটি খুব শক্ত ক'রে ছিপি দিয়ে এঁটে দাও। দু'মিনিটেরও তর সইবে না! বন্দুকের আওয়াজের মত গুড়ুম

শব্দের সাথে নলের ছিপি কোন্ দূরে গিয়ে ছিটকে পড়বে, আর সাথে সাথে নলের খোলা মুখ দিয়ে হুস্ হুস্ ক'রে বাতাস বেরুতে সুরু করবে।
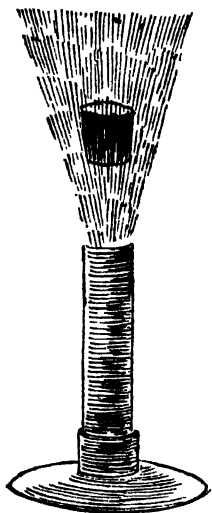
নলের ছিপি ছিট্‌কে যাচ্ছে

এসব শুনে শুনে তোমাদেরও হয়ত হাত সুড়সুড় করছে একবার গলানো বাতাসে আঙুল ডুবাতে। কিন্তু সাবধান! ভুলেও যেন ওটি করতে যেয়ো না। যেই আঙুলটি চুবিয়েছ, অমনি প্রথমে দারুণ ঠাণ্ডা, তারপর ফোস্কা এবং মিনিট দু' তিনের মধ্যেই সেখানকার রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে আঙুলের ডগাটি একেবারে পাথরের মত শক্ত হয়ে অবশ হয়ে যাবে। চাই কি, তখন তাকে শ্লেট্-পেন্সিলের মত মট্ ক'রে ভেঙে দু' টুকরো ক'রে ফেলাও মোটেই কঠিন হবে না। আর ভাঙ্‌লে পরে এক ফোঁটা রক্তও বেরুবে না। মানুষ বুদ্ধি খাটিয়ে বাতাসকে তার অনিচ্ছায় বন্দী দশায় ফেলেছে বলে বাতাসও সুবিধে পেলেই তার শত্রুর ওপর প্রতিশোধ নিতে কসুর করবে না; এটা যেন ভুলে যেয়ো না।

কবে থেকে বাতাসকে গলিয়ে ফেল্‌বার চেষ্টা সুরু হয় এবং কোন্ কোন্ বৈজ্ঞানিক এ বিষয়ে গবেষণা ক'রে গেছেন তার ইতিহাস জানবার আগে বাতাস জিনিষটি কি, এর প্রকৃতিই বা কেমন, বৈজ্ঞানিকদের মনেই বা বাতাসকে গলাবার ইচ্ছা কেন হ'ল, তা' জেনে রাখা ভাল। কিন্তু সে কাহিনী আরম্ভ করার আগেও রসায়ন-বিজ্ঞানের একবারে গোড়ার দিকের দু'একটা কথা জেনে নিতে হয়।

তোমার মা'র বাক্সে যত গয়নাপত্তর আছে তার হাজারটা হাজার নামের বা হাজার ডিজাইনের হ'লেও সেগুলি যেমন সোনা, রূপা, হীরা, মুক্তা প্রভৃতি মাত্র অল্প কয়েকটি জিনিষ দিয়ে তৈরী তেমনি আমাদের এই বিশাল পৃথিবীতে কোটী কোটী জিনিষ থাকলেও তা' মাত্র ৯২টি মূল জিনিষ দিয়ে তৈরী। বৈজ্ঞানিকগণ এই মূল জিনিষ কয়টির নাম দিয়েছেন মৌলিক পদার্থ এবং এসব মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে পৃথিবীর বাদবাকী যত জিনিষ তৈরী হয়েছে তাদের নাম দিয়েছেন যৌগিক পদার্থ। সোনা, রূপা, লোহা, তামা, এলুমিনিয়াম, পারা, সীসা, টিন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, ক্লোরিন, সোডিয়াম, কার্ব্বন, আর্গন, হিলিয়াম ইত্যাদি মৌলিক পদার্থ।

এক টুক্‌রা সোনা বা অন্য কোন মৌলিক পদার্থ যদি

ভাঙা সুরু করা যায় এবং এক টুক্‌রাকে দু'টুক্‌রা, দু'টুক্‌রাকে চার টুক্‌রা—এমনি ভাবে কেবলই ভাঙা যায়, তা' হ'লে টুক্‌রাগুলি ছোট হ'তে হ'তে শেষে এত ছোট হবে, যখন আর তা' ভাঙা চল্‌বে না। এমনি ছোট টুক্‌রাকে বলা হয় পরমাণু, (Atom)। একতাল সোনার যে সব গুণ আছে, এমনি ছোট্ট সোনার একটি পরমাণুতেও সে সকল গুণই সম্পূর্ণ অপরিবর্ত্তিত থাকে। সমস্ত মৌলিক পদার্থের ধর্ম্মই এই।

এখন এক টুক্‌রা লবণ নিয়ে যদি তাকে সোনার মতন ভাঙতে সুরু কর, তা' হ'লে এমন এক অবস্থায় এসে পৌঁছুবে যখন লবণের টুক্‌রাকে ভেঙে ফেললে তা' আর লবণ থাকবে না। এমন যে ছোট টুক্‌রা একে বলে অণু (molecule)। এক অণু লবণকে যদি আরও ভাগ করা যায় তবে আমরা তা' থেকে যে দু'টি জিনিষ পাব তা' কোন দিক দিয়েই লবণের মত নয়; সে দু'টি জিনিষ হচ্ছে সোডিয়াম ও ক্লোরিন। তোমাদের মধ্যে যারা কলিকাতার বাসিন্দা তাদের নিকট ক্লোরিনের গন্ধটি অপরিচিত নয়। কেন না, বর্ষাকালে জলের সহিত এত বেশী ক্লোরিন মেশান হয় যে, জল খেতে গেলেই সেই বিদ্‌ঘুটে গন্ধটি নাকে লাগে।

লবণের অণুর মত এক অণু জলকেও যদি বিশ্লেষণ করা যায়, তা' হ'লে দেখা যাবে, তাতে দু'ভাগ হাইড্রোজেন এবং

এক ভাগ অক্সিজেন আছে। কাজেই জল এবং লবণ, এই দু'টি যৌগিক পদার্থ।

একটু আগে আমি 'রাসায়নিক সংযোগ' কথাটি ব্যবহার করেছি। এ সম্বন্ধেও দু'একটা কথা বলা দরকার। মনে কর, তোমার মা ভাঁড়ার বা'র ক'রে দিচ্ছেন। চাল ডাল নামানো হয়েছে এমন সময় তোমার ছোট ভাইটি ছুটে এসে মাকে ধরতে যেয়ে চাল ডাল সব মিশিয়ে দিলে। এতে তোমার মা'র কাজ অনেক বেড়ে গেল বটে, কিন্তু আসলে চাল বা ডালের কোন পরিবর্ত্তন হ'ল না, অর্থাৎ এই চাল ডাল একত্র হয়ে নূতন কোন তৃতীয় জিনিষ তৈরী হ'ল না। একটু পরিশ্রম করলেই চাল ডাল আবার আলাদা করা যায়।

কিন্তু চূণ আর হলুদ যদি মিশাও, কি হবে? চূণ ধব্‌ধবে সাদা, হলুদ হল্‌দে। কিন্তু এই দু'টি জিনিষ মিশিয়ে নূতন একটি লাল টুক্‌টুকে জিনিষ তৈরী হ'ল, তা' চূণ বা হলুদ এই দুই জিনিষ থেকে একেবারেই পৃথক্‌। একে চূণও বলা চলে না, হলুদও বলা যায় না। চাল আর ডালের এই যে মিশ্রণ, একে বলা যেতে পারে মিশ্র পদার্থ, আর চূণ হলুদে মিশে যে একটি নূতন যৌগিক জিনিষ তৈরী হওয়া, তাকে বলা হয় রাসায়নিক সংযোগ।

আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণের বিশ্বাস ছিল যে ক্ষিতি, অপ্‌,

তেজ, মরুৎ, ব্যোম্—এই পঞ্চভূতই বিশ্বসৃষ্টির মূল। কিন্তু নব্য বিজ্ঞান এ বিশ্বাসকে ভুল বলে প্রমাণ করেছে। আজ-কালকার বৈজ্ঞানিকদের মতে এদের একটিও ভূত অর্থাৎ মৌলিক পদার্থ নয়। মরুৎ বা বায়ু যে মৌলিক পদার্থ নয়, ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিক শীল তা' প্রথম উপলব্ধি করেন। পরে ক্যাভেণ্ডিস্, প্রিষ্টলি, ল্যাভোসিঁয়ে প্রভৃতি মনীষিগণ নানা পরীক্ষা ক'রে দেখান যে, বাতাস অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন নামে দু'টি মৌলিক গ্যাসের সংমিশ্রণ এবং তাঁরা আরও প্রমাণ করেন যে, বাতাস মিশ্র পদার্থ।

বৈজ্ঞানিকগণের আধুনিক গবেষণার আলোকে আমরা জানতে পারি যে, বাতাসে আছে—

অক্সিজেন	২০'৬০ ভাগ
নাইট্রোজেন	৭৭'১৬ "
জলীয় বাষ্প	১'৪০ "
আর্গন, হিলিয়াম ইত্যাদি	০'৮০ "
কার্ব্বন ডায়ক্সাইড	০'০৪ "
মোট	১০০ ভাগ

বাতাসের মধ্যে যে আর্গন, হিলিয়াম ইত্যাদি মৌলিক পদার্থ আছে, তা' মাত্র অল্প কয়েক বৎসর আগে আবিষ্কৃত হয়েছে এবং তা' আবিষ্কার করেছেন স্যার উইলিয়াম র‍্যামজে।

এই যে সোনা, জল আর বাতাসের কথা বলা হ'ল, এদের একটি কঠিন (Solid), একটি তরল (Liquid) এবং একটি বায়বীয় (Gaseous)। পৃথিবীতে যত জিনিষ আছে তার সবগুলিকেই এই তিন ভাগে ভাগ করা চলে। সাধারণ অবস্থায় যে জিনিষ শক্ত, তাকে বলি কঠিন পদার্থ। যেমন—লোহা, সোনা, সীসা। তেমনি যেগুলি জলের মত অবস্থায় থাকে তাকে বলি তরল পদার্থ। যেমন জল, দুধ, তেল। আর যেগুলি বাতাসের মত, তাদের বলি বায়বীয় পদার্থ। যেমন—বাতাস, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ইত্যাদি। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, এমন শ্রেণীবিভাগের সত্যি সত্যি কোন মানে নেই। তাঁরা বলেন, যে জিনিষ যে অবস্থায়ই থাক্ না কেন, তাকে অন্য দুই অবস্থায় রূপান্তরিত করা যেতে পারে।

জলের কথাই ধরা যাক। সাধারণ অবস্থায় জল তরল পদার্থ। কিন্তু একে জমিয়ে নিলেই তার চেহারা বদলে গিয়ে হ'ল কঠিন বরফ। আবার খুব বেশী তাপে ফুটিয়ে নিলেই জলের রূপ বদলে গিয়ে হ'ল হাল্‌কা ষ্টিম বা বাষ্প। কাজেই গ্লাসে ক'রে যে জল খেয়ে তেষ্টা মিটাও, খুব বেশী জ্বরের সময় যে বরফ মাথায় চাপাও, বা যে বাষ্পের জোরে বড় বড় এঞ্জিন চলে, আসলে তা' একটি জিনিষেরই তিনটি বিভিন্ন অবস্থা মাত্র। জলের সম্বন্ধে যে কথা সত্যি আর আর জিনিষের

বেলায়ও যে তা' খাটবে বৈজ্ঞানিকগণ একথা খুব জোর গলায়ই বল্লেন।

তাই হরেক রকম জিনিষ নিয়ে বৈজ্ঞানিক মহলে নানা রকম গবেষণা চলল। কঠিন ও তরল পদার্থকে অন্য দুই অবস্থায় রূপান্তরিত করতে চেষ্টা ক'রে তাঁরা অপেক্ষাকৃত সহজেই সফল হলেন এবং এতে উৎসাহিত হয়ে গ্যাস নিয়ে কাজ সুরু করলেন। বাতাস গলানো এবং গলানোর পর আবার তাকে জমিয়ে শক্ত করার মূলেও সেই একই চেষ্টা। এই চেষ্টা যে খুব সহজে সফল হয়েছে তা' নয়। যে বাতাস বা গ্যাস অনন্ত আকাশে পালিয়ে বেড়ায় তাকে বিজ্ঞানের জালে বন্দী ক'রে খুসী মত তরল বা কঠিন করা, এ যে দু'এক দিনে বা দু'এক জনের চেষ্টায় হয়েছিল তা' নয়। এর পেছনে রয়েছে তখনকার দিনের সেরা সেরা বৈজ্ঞানিকদের শতাব্দী-ব্যাপী চিন্তা ও সাধনা।

এখানে একটু বৈজ্ঞানিক তথ্যের অবতারণা প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, কঠিন, তরল বা বায়বীয় যে অবস্থারই হোক্ না কেন, প্রত্যেক জিনিষই খুব ছোট ছোট অণুর সমষ্টি। এই অণুগুলির মধ্যে মধ্যে ফাঁক আছে এবং এরা সারাক্ষণ ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে। এই অণুগুলি এত ছোট যে, খালি চোখে দূরে থাক্, খুব শক্তিশালী অণুবীণ দিয়েও এগুলি দেখা যায়

না। আধ ইঞ্চিরও কম লম্বা, চওড়া ও উঁচু এইটুকুন একটা বাক্সে সাধারণ অবস্থায় যতটুকু বাতাস ধরে, পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, তার মধ্যে ২৭০০০০০০০০০০০০০০০০০০০টি অণু আছে! এ থেকেই বুঝতে পার, এই অণু জিনিষটি কি রকম ক্ষুদ্র। এতগুলি বালুকণা যদি সমুদ্রতীর থেকে তুলে আনতে হয় তা' হ'লে যে গাড়ীখানির দরকার হবে, তার আয়তন কত হবে অনুমান করতে পার? সে গাড়ীর মাপ হবে এক মাইল লম্বা, এক মাইল চওড়া ও সিকি মাইল উঁচু। বোঝ কি ব্যাপার!

অণুগুলির মাঝে মাঝে যে ফাঁকা জায়গা আছে তা' সহজেই পরীক্ষা করা যায়। মেজার গ্লাসে এক আউন্স জল নাও। তার মধ্যে কতটুকু চিনি ফেলে দাও। চিনিটা গলে গেলে দেখবে, যে দাগ পর্য্যন্ত জল ছিল, চিনি দেবার পরও জল সেই দাগ পর্য্যন্তই আছে। অণুগুলির মাঝে মাঝে ফাঁক না থাকলে কিছুতেই এরূপ হ'ত না।

তারপর, কঠিন, তরল ও বায়বীয় সকল জিনিষের অণুগুলিই যে অনবরত ছুটোছুটি করছে, বৈজ্ঞানিকগণ তা'ও প্রমাণ করেছেন। গ্যাসের বেলায় এই ছুটোছুটির কথাটা বোঝা সোজা। শশার মত লম্বা সাইজের রাবারের যে সব বেলুন আজকাল রাস্তায় ফেরি ক'রে বিক্রী হয়, তার একটার ঠিক মাঝ খানটায় শক্ত ক'রে বেঁধে যদি ফুঁ দাও, তা'হ'লে

দেখবে, উপরের অর্দ্ধেক বেশ ফুলে গেছে, কিন্তু সূতার গাঁটের নীচের অর্দ্ধেক চিম্‌সে হ'য়েই আছে। এই অবস্থায় এখন বেলুনের মুখটা বেঁধে যদি মাঝের বাঁধন খুলে দাও, তা'হলে দেখবে, নিমেষ ফেলতে না ফেলতে সমস্ত বেলুনটাই বাতাসে ভরে গেছে। বাতাসের অণুগুলি খুব ছুটোছুটি না করলে কখনও এমনটি হ'ত না।

একটা বাটিতে কালি গুলে যদি তোমার টেবিলের উপর রেখে দাও, তা' হ'লে দেখবে, রোজই একটু একটু ক'রে শুকিয়ে আসছে। কেন এমন হয় জান? কারণ সেই একই—কালির উপরের স্তরে যে সব অণু ছুটোছুটি করছে তারা সব কালির স্তর ছেড়ে বাতাসের সহিত মিশে যাচ্ছে। কালির অণুগুলোর কোন গতি না থাক্‌লে এ হ্‌তে পারত না।

সকল জিনিষের অণুই দিন রাত ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে বটে, কিন্তু কঠিন, তরল ও বায়বীয় ভেদে এই ছুটোছুটিরও বিভিন্নতা আছে। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, কঠিন পদার্থের বেলায় এই অণুর ছুটোছুটির পথ খুব সঙ্কীর্ণ ও সুনির্দ্দিষ্ট। আর তা' ছাড়া, তাদের পরস্পরের আকর্ষণ এত বেশী যে, একটি অণু আর একটি অণুকে ছেড়ে বড় বেশী দূরে যেতে পারে না। ফলে, কঠিন পদার্থের আকারেরও কোন পরিবর্ত্তন হয় না।

তরল পদার্থের বেলায় অণুগুলির ছুটোছুটির পথ ও গতি

অনেকখানি বেড়ে যায়। তাদের ছুটোছুটির পথও কঠিন পদার্থের মত তেমন নির্দ্দিষ্ট নয়। তাদের পরস্পরের আকর্ষণও অনেকটা কমে' যায়, তবে একেবারে কমে' যায় না। তাই মুখখোলা পাত্রে রাখলে তৎক্ষণাৎ উড়ে না গেলেও তাদের কোন সুনির্দ্দিষ্ট আকার নেই। যখন যে আকারের পাত্রে রাখা যায়, তরল পদার্থের আকারও সেই রকমই হয়ে থাকে।

কিন্তু গ্যাসের বেলায় অণুগুলির পরস্পরের আকর্ষণ এত কমে' যায় যে, তাদের কোন আকর্ষণ নেই বল্লেই চলে। তাদের ছুটোছুটিও এত বেড়ে যায় যে, বদ্ধপাত্র থেকে পালাবার পথ না পেয়ে তারা বারবার দেওয়ালের এবং পরস্পরের গায় অনবরত ধাক্কা দিতে থাকে। তখন তাদের আর দিগ্বিদিক্ জ্ঞান থাকে না। এদের এই ছুটোছুটি যে কত বেশী হয় তা' জলের ও বাষ্পের আয়তন থেকেই বুঝতে পারবে। একটা গ্লাসে যতটুকু জল ধরে, তা' যদি ফুটিয়ে বাষ্প করা যায় তবে তা' ধ'রে রাখতে সেরূপ ১৬০০টি গ্লাসের দরকার হয়ে পড়ে। এই দুরন্ত স্বভাবের জন্য সব সময়ই গ্যাসকে বদ্ধ পাত্রে রাখতে হয়।

এ অবধি যদি বুঝে থাক তা' হ'লে সহজেই বুঝতে পারবে যে, গ্যাসকে তরল করতে হ'লে তার অণুগুলির এই ছুটোছুটি বন্ধ করতে হবে অর্থাৎ চাপ বাড়িয়ে বাড়িয়ে এর আয়তন কমাতে হবে। কিন্তু এখানেও একটা মুস্কিল, চাপ দিয়ে দিয়ে

যদি গ্যাসের আয়তন কমান যায় তা' হ'লে এদের পরস্পরের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি বেড়ে যাওয়ায় গ্যাসের উত্তাপও বেড়ে যায়। তাই চাপ বাড়িয়ে আয়তন কমানো এবং সাথে সাথে তাপ কমানোর দিকে বৈজ্ঞানিকের নজর পড়ল এবং এজন্য নানা ফন্দী-ফিকির আবিষ্কৃত হ'তে লাগল।

বায়বীয় পদার্থকে তরল করার প্রথম চেষ্টা সফল হয় ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে; আর সে সাফল্যের গৌরব লাভ করেন মাইকেল ফ্যারাডে। তিনি তখনকার দিনের একজন খুব নামকরা বৈজ্ঞানিক ছিলেন। অথচ তোমরা শুনে অবাক্ হবে যে, তেরো থেকে বাইশ বছর বয়স পর্য্যন্ত তাঁর দিন কেটেছে দপ্তরীর দোকানে। তাঁর জীবনেতিহাস এক বিচিত্র কাহিনী! তিনিই ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ক্লোরিন ব'লে একটা মৌলিক গ্যাসকে তরল ক'রে বৈজ্ঞানিক গবেষণার এক নূতন পথ খুলে দেন।

তারপর থেকে পৃথিবীর নানা জায়গার নামকরা বৈজ্ঞানিকগণ এ সম্বন্ধে নানাভাবে মাথা খাটিয়ে নূতন নূতন গ্যাস গলাতে থাকেন। এই পরীক্ষাকালে তাঁদের কতজন কতবার মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন, কতবার মরতে মরতে বেঁচে গেছেন! কিন্তু অজানাকে জানবার, অসাধ্যকে সাধন করবার দিকে বৈজ্ঞানিকদের দুর্জ্জয় পণ থাকে। তাই এসব দুর্ঘটনার ভয়েও তাঁরা পেছিয়ে যান নি।

ফ্যারাডে ছাড়াও আর যে-সব বৈজ্ঞানিক বায়বীয় পদার্থকে তরল করবার সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রে গেছেন, তাঁদের মধ্যে সুইট্‌জারল্যাণ্ডের আর্ পিকটেট্ এবং ক্যালিটেট্, পোল্যাণ্ডের রবলিউস্কি এবং ওল্‌জিউস্কি; ইংলণ্ডের দেওয়ার প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাতাসকে প্রথম গলানো হয় ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে, আর তা' ক'রে গেছেন জার্ম্মেণীর সি লিণ্ডে এবং ইংলণ্ডের ডবলিউ হ্যাম্পসন। প্রথম প্রথম খুব সামান্য পরিমাণ বাতাস গলাতেই বহু অর্থ ও পরিশ্রম করতে হ'ত; কিন্তু নিউ ইয়র্কের চার্লস ই ট্রিপ্লার সস্তায় এবং বিপুল পরিমাণে বাতাস গলাবার পথ বা'র করেন।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে ক্লড সাহেবও লিণ্ডে এবং হ্যাম্পসনের যন্ত্র-পাতির উন্নতি সাধন ক'রে প্রচুর পরিমাণে গলানো বাতাস পাবার ব্যবস্থা করেছেন।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে সব চেয়ে 'বেয়াড়া' গ্যাস হিলিয়ামকে গলাবার এবং জমাবার চেষ্টা সফল হয় এবং এ সাফল্য অর্জ্জন করেন বৈজ্ঞানিক ওনস্। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বৈজ্ঞানিকদের জানা সব জিনিষকেই গলাবার চেষ্টা সফল হয়েছে। বিজ্ঞান সাধনার দিক থেকে ঐ সাফল্য বড় কম জিনিষ নয়।

বায়বীয় পদার্থ তরল করলে যে তার তাপ বরফের চেয়েও দু'শো আড়াইশো ডিগ্রী কমে' যায় তা' আগেই বলেছি। এখন চাপের কথা একটু আলোচনা করা যাক্। লিণ্ডে যে উপায়ে বাতাসকে তরল করেন তাতে বায়ুমণ্ডলের চাপের দু'শো গুণ চাপের প্রয়োজন হয়েছিল।

বায়ুমণ্ডলের চাপ কথাটা হয়ত তোমাদের নিকট নূতন। বাতাস না থাকলে যে আমরা পাঁচ মিনিটও বাঁচতে পারতাম না, তা' নাক-মুখ বন্ধ ক'রে রেখে অনায়াসেই পরীক্ষা করতে পার। পৃথিবীর সমস্ত জায়গা জুড়ে এই বায়ুপ্রবাহ চলছে বলেই আমরা বেঁচে আছি। মাটী থেকে বায়ু ক' মাইল উপর পর্য্যন্ত বিস্তৃত তা' কেউ ঠিক বলতে পারেন না। তবে একথা ঠিক, মাছ যেমন সাগরজলে বাস করে, আমরাও তেমনি এই বায়ুসমুদ্রে ডুবে আছি। তবে মাছ যেমন জলে সাঁতার কেটে উপর-নীচে উঠা-নামা করতে পারে, বায়ুসমুদ্রে আমরা তেমন সাঁতার কাটতে পারি না।

তুলার বস্তা একটার উপর আর একটা, তার উপর আর একটা—এভাবে রেখে গেলে যেমন সব চেয়ে নীচের বস্তার ওপর উপরের বস্তাগুলোর চাপ পড়ে, তেমনি বায়ুর নীচের স্তরের ওপর উপরের স্তরগুলি অনবরত চাপ দিচ্ছে। হিসাব ক'রে দেখা গেছে যে, প্রতি এক বর্গ ইঞ্চি জায়গার ওপর এই

বায়ুস্তরের চাপের পরিমাণ প্রায় ৭॥০ সের। আমাদের গোটা শরীরের ওপর প্রায় ৪০০ মণ চাপ লেগেই আছে। দু'মণ একটা বস্তা তুলতেই যেখানে আমাদের প্রাণান্ত হয়, সেখানে এই বিরাট চাপের ফলে চ্যাপ্টা না হয়ে কি ভাবে এমন নির্ব্বিকার আছি, সে একটা প্রশ্ন বটে!

দড়ি টানাটানি খেলা দেখেছ?—ইংরেজীতে যাকে 'টাগ্ অব্ ওয়ার' বলা হয়। যতক্ষণ দু'পক্ষের টানই সমান থাকে, ততক্ষণ দড়িটি একচুল এদিক-ওদিক হয় না, দড়িটিতে টান পড়েছে কি না, তাই বোঝা যায় না। আমাদের শরীরেও তেমনি চারদিক থেকে চাপ প'ড়ে সবগুলো চাপ কাটাকাটি হয়ে যায় বলে' আমরা টেরই পাইনে যে, আমাদের ঘাড়ে এমন একটা বিরাট দৈত্য চেপে আছে!

কোন রকমে যদি একদিকের চাপ সরিয়ে ফেলা যায় তা' হ'লেই বোঝা যায়, বায়ুমণ্ডলের চাপ কী ভীষণ! একটা সোজা উপায়ে পরীক্ষা করতে পার। একটা কাঁসা বা পেতলের গ্লাসে খানিকটা স্পিরিট ঢেলে দেশলাই ধরিয়ে দাও। দাউ দাউ ক'রে জ্বলে ওঠার মিনিট খানেক পরে ভেসেলিন-মাখা একটা খুব পাতলা কাচ দিয়ে গ্লাসের মুখটা চেপে ধর। আস্তে আস্তে ভেতরের আগুন নিবে যাওয়ার পর দেখবে হঠাৎ কাচটা সশব্দে ভেঙ্গে গেল। কারণটা আর কিছুই নয়। গরমে

গ্লাসের ভেতরের বায়ু হালকা হওয়ায় তার চাপ অনেকটা কমে' যাওয়ার ফলে উপরের বায়ুমণ্ডলের চাপ সইবার আর তার ক্ষমতা রইল না।

অনেক দিন আগে গেরিক নামে এক বৈজ্ঞানিক বায়ুর চাপ সম্বন্ধে একটি ভারী সুন্দর পরীক্ষা করেন। একটি বলকে ঠিক মধ্য খানটায় কেটে ফেললে যেমন হয়, তিনি পেতলের তেমন ছুইটি আধা বল দিয়ে একটি আস্ত বড় বল তৈরী করেন। ছুটো অর্দ্ধেক ঠিক মুখে মুখে মিলিয়ে তিনি যন্ত্র-সাহায্যে ভেতরের বাতাস বা'র ক'রে ফেলেন। পরে এক এক অর্দ্ধেকে তিনটি ক'রে ঘোড়া জুতে তাদের উল্টে দিকে চালান। কিন্তু এত টানাটানিতেও আধা বল ছুইটি কিছুতেই খোলা গেল না। এ থেকেই বুঝতে পার, বাতাসের চাপ কতখানি! ভাগ্যিস চারদিকের চাপে চাপে কাটাকাটি হয়ে যায়, নইলে আমরা কবে চ্যাপ্টা হয়ে যেতাম! বাতাস গলাতে এমনি চাপের ছু'শো গুণ চাপের দরকার হয়। ভাব, সে কী চাপ!

বৈজ্ঞানিকগণ এত বছর ধ'রে এমন প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে যে বাতাস ও আর আর বায়বীয় পদার্থকে গলাবার পথ আবিষ্কার করেছেন, এ যে তাঁদের একটা খামখেয়ালি তা' মনেও ভেবো না। এর মূলেও রয়েছে সত্য প্রতিষ্ঠা ও নূতন তথ্য জানবার আগ্রহ। কতকগুলি বৈজ্ঞানিক তথ্য আছে যার

সত্যাসত্য পরখ ক'রে দেখতে হ'লে খুব কম ঠাণ্ডার দরকার। গলানো গ্যাসের সাহায্যেই সে সব পরখ সম্ভবপর হয়েছে। অনেকগুলি রাসায়নিক পদার্থ আছে, যা খাঁটি কি না, তা' গলানো বাতাসের সাহায্যে খুব সহজে পরখ করা যায়।

ব্যবসায় ক্ষেত্রে গলানো গ্যাস আজকাল দিন-রাত ব্যবহার হচ্ছে। এই যে গরমের দিনে এক পয়সার বরফ এনে চার গ্লাস সরবৎ তৈরী হয়, সে বরফ তৈরীর ব্যাপারে গলানো 'এমোনিয়া' গ্যাস অনেকখানি সাহায্য করে। গলানো গ্যাসের সাহায্য না পেলে এক সের বরফ আট আনায়ও পাওয়া যেত কিনা সন্দেহ! সোডা ওয়াটার তৈরী এবং নানারকম ঔষধেও আজকাল অনবরত গলানো গ্যাস ব্যবহার করা হচ্ছে। কার্ব্বন ডায়োক্সাইড্ জমিয়ে আজকাল আবার জলশূন্য বরফও তৈরী হয়েছে, আর তা' এই কলকাতার বাজারেই বিক্রী হচ্ছে।

শীতের দেশের লোক ফরসা বলে' অনেকদিন পর্য্যন্ত অনেকের ধারণা ছিল যে, খুব বেশী ঠাণ্ডায় থাকলেই বুঝি মানুষের গায়ের রং সাদা হয়ে যায়। এ ধারণার মূলে যে কোন সত্য নেই তা' মেরুপ্রান্তবাসী এস্কিমোদের গায়ের কালো চামড়া দেখলেই বোঝা যায়। তবু বৈজ্ঞানিকগণ গলানো বাতাস নিয়ে এ বিষয়টি পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন।

কতকগুলি রঙ্গীন জিনিষ গলানো বাতাসে ফেলে দেখা গেছে যে, তাদের রং যেন একটু ফ্যাকাসে হয়ে যায়। গন্ধক যে হল্‌দে তা' তোমরা সবাই জান। গলানো বাতাসে ফেলে দিলে তা' দুধের মত ধব্‌ধবে সাদা হয়ে যায়।

তোমাদের মধ্যে যাদের গায়ের রং কালো, তাদের নিশ্চয়ই গন্ধকের খবর শুনে ফরসা হবার সাধ হচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ পরিবর্ত্তন স্থায়ী নয়। আর তা' ছাড়া গলানো বাতাসে ডুব দিলে একবারে এমনি ভাবে জমে' যাবে যে, চোখ মেলে চেয়ে আর তোমার ঐ ফরসা চেহারাখানা দেখবার সুযোগই পাবে না। গলানো বাতাসের নিজের রং একটু নীল কিনা, তাই কাউকে সে একবারে সাদা করতে চায় না।

বাতাসের মত এমন একটা সাধারণ জিনিষের জীবন-কাহিনীও যে এমন রহস্যময়, তা' ভাবলে অবাক্ হ'তে হয় না কি ?

মামাবাড়ীতে গেলে দাদামশায়ের পাকা চুল বাছাই করা আর তাঁর মুখে নানারকম গল্প শুনা ছিল আমাদের এক মস্ত আনন্দ।

দাদামশায়ের ঝুলিতে এত গল্প জমা থাকত আর সেগুলি এত বিচিত্র যে, শুনতে শুনতে আমরা এক এক সময়ে নাওয়া-খাওয়া পর্য্যন্ত ভুলে যেতাম।

মামাদের বাড়ীখানা ছিল ঠিক পদ্মার উপর। বাইরের ঘরে বসলেই দেখা যেত ঢেউএর খেলা, আর কাণে ভেসে আসত জলের বিচিত্র সুর।

আমি আর মাসতুতো বোন্ শৈল কতদিন বসে বসে পালের নৌকা গুণেছি, ছোট ছোট লঞ্চগুলির বাঁশীর শব্দ অনুকরণ

করতে যেয়ে গাল মুখ ফুলিয়ে একরকম কিম্ভূতকিমাকার শব্দ বা'র করেছি—ফুঁ···উ···কু···উ!

শৈল তখনও ভাল ক'রে গুণতে শেখেনি। তাই তার গণার ভুল শুধরে দেবার ছলে তা'কে কতবার নাকাল করেছি। আমার জ্বালায় অস্থির হয়ে ও যখন কাঁদো-কাঁদো হয়ে উঠত, দাদামশায় তখন তাকে আদর ক'রে ডেকে বলতেন, —"দিদিমণি! শৈ! আমার কাছে আয়! চমৎকার একটা গল্প বলছি!"

দাদামশায়ের গল্প! অমনি দু'জনেই ছুটে' যেয়ে একেবারে তাঁর কোল ঘেঁসে বসতাম; মুহূর্ত্তে শৈলর সাথে আমার ভাব হয়ে যেত।

দাদামশায় একটা মোটা তাকিয়া হেলান দিয়ে বসতেন, আর গড়গড়ায় তামাক টানতেন। আমি আর শৈল দু'পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর মাথাভরা পাকা চুল নিয়ে টানাটানি সুরু করতাম। দাদামশায় তাঁর ঝুলি থেকে এক একটি ক'রে গল্প বা'র করতেন।

শুধু যে রাজা-উজীর, রাক্ষস-খোক্কস, ভূত-পেত্নীর গল্পই তাঁর ঝুলিতে ছিল তা' নয়। ইতিহাসের গল্প, বিজ্ঞানের গল্প, শিকারের গল্প, ডাকাতের গল্প এমনি নানা গল্পে তাঁর ঝুলি ভরা থাকত। ছোটবেলায় তাঁর মুখে এসব গল্প শুনে যে কত নূতন

জিনিষ শিখেছি! মামাবাড়ী থেকে ফিরে এসে সে-সব গল্প বন্ধুদের বলে' কতদিন তাদের একবারে তাক্ লাগিয়ে দিয়েছি!

তারই একটা গল্প আজ তোমাদের বলছি। কতদিন আগেকার শোনা! তাই হুবহু দাদামশায়ের মত ক'রে বলা আজ আর সম্ভব নয়। তবুও তাঁর মুখে শোনা মার ছোটবেলার গল্প তোমাদের ভাল লাগবে বলেই আমার বিশ্বাস! যাক্, আর ভনিতা না ক'রে এবার আসল গল্প আরম্ভ করা যাক্। তবে এই খানেই বলে' রাখি যে, এই মা আমাদের পৃথিবী-মা!

* * *

পদ্মার ভাঙন দেখেছ?

এবছর যেখানে চমৎকার ঘরবাড়ী, পরের বছর সেখানে শুধু অথৈ জলের খেলা! আবার আজ যেখানে বিরাট জলস্রোতের অশ্রান্ত গর্জ্জন, কালই সেখানে ধূ ধূ করে রূপালি বালির চর! পদ্মার এই খামখেয়ালীর ফলে যে বছর বছর কত পরিবারকে বিপন্ন হ'তে হয়, গৃহ-হারা হ'তে হয়!

এই ভাঙা-গড়ার কাজ যে শুধু নদীরই একচেটিয়া তা' নয়। পৃথিবীর নানা জায়গায় দিন-রাত নানা ভাঙা-গড়া চলছে! পাহাড় ধ্বসে পড়ছে, বরফের স্তূপ গড়াতে গড়াতে চলেছে, ভূমিকম্পে এক একটা সমৃদ্ধ সহর শ্মশানে পরিণত হচ্ছে, ঝড়-তুফানে গাছপালা উপড়ে পড়ছে, নদী-নালার স্রোত এক পথ

থেকে নূতন পথে চলছে। ফলে আমাদের এই মাটী-মায়ের চেহারা নানা জায়গায় নানা ভাবে বদলে যাচ্ছে।

এই যে রূপ পরিবর্ত্তন, এ দেখে দেখে আমাদের মনে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে, সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় পৃথিবীর চেহারা কেমন ছিল? পৃথিবীর সৃষ্টির গোড়ার কথাই বা কি!

এ প্রশ্নের সোজাসুজি উত্তর দেওয়ার আমাদের সব চেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে যে, জননীর জন্ম সময়ে তার ছেলে-মেয়েদের কারও জন্ম হয়নি। কাজেই শুধু পণ্ডিতদের অনুমান এবং হিসাব নিকাশের উপর নির্ভর করেই জননীর জন্ম-ইতিহাস রচিত হয়েছে।

জননীর জন্মকথা বুঝতে হ'লে, আগে আমাদিগকে মাথার উপরের অন্তহীন আকাশের অন্যান্য অধিবাসীদের সাথে চেনা পরিচয় ক'রে নিতে হবে।

ভোর হ'তে না হ'তেই আমরা দেখতে পাই পূবদিকে সোনার থালার মত লাল টুকটুকে সূর্য্য উঠ্ছে। তখন তার কিরণ থাকে স্নিগ্ধ। যতই বেলা বাড়তে থাকে, সূর্য্যও ততই মাথার উপরে উঠতে থাকে, আর তার কিরণও তত প্রখর হ'তে সুরু করে। আবার বেলা প'ড়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ে, তার কিরণও আস্তে আস্তে শীতল হ'তে থাকে।

এ দেখে প্রথমে মনে হয় পৃথিবী বুঝি স্থির হয়ে আছে, আর সূর্য্যই পূব থেকে পশ্চিমে চলেছে। কিন্তু এ যে সত্য নয় বহুদিন আগেই তার প্রমাণ হয়ে গেছে। আমরা এখন জানি, সূর্য্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরেনা—পৃথিবীই সূর্য্যের চারদিকে ঘুরছে।

আরও একটা কথা। সূর্য্যের দিকে চাইলে কিছুতেই তাকে একটা থালার চেয়ে বেশী বড় বলে মনে হবে না। কিন্তু সত্যি কি তাই? মোটেই তা' নয়। সূর্য্য আমাদের এই পৃথিবীর চেয়ে তের লক্ষ গুণ বড়, অর্থাৎ আমাদের এই পৃথিবীর মত তের লক্ষ পৃথিবী জোড়া দিলে একটা সূর্য্যের সমান হবে।

এত বড় যে সূর্য্য, তাকে এত ছোট দেখায় কেন, এ প্রশ্ন তোমাদের মনে জাগতে পারে। এ প্রশ্নের উত্তরও কিছু শক্ত নয়। তোমরা যখন ঘুড়ি উড়াও তখন হয়ত লক্ষ্য ক'রে থাকবে, ঘুড়ি যতই উপরে উঠে তাকে ততই ছোট দেখায়। একটা ঘুড়ি আর কতটুকু উপরে উঠে? এতেই যখন একে এত ছোট দেখায়, তখন যে-সূর্য্য পৃথিবী থেকে নয় কোটী ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে, তাকে এত ছোট দেখাবে তাতে আর বিচিত্র কি?

এই ত গেল দিনের বেলার কথা। রাতের আকাশের দিকে চাইলে আবার দেখতে পাই আর এক বিচিত্র দৃশ্য!

আকাশের বুকে তখন হাজার হাজার তারা মণিমাণিক্যের মত মিট্ মিট্ ক'রে জ্বলছে।

দেখতে এই টুকুন্ হ'লেও বাস্তবিক এরা মোটেই ছোট নয়। সূর্য্য যেমন দূরে আছে বলে' থালার মত ছোট দেখায়—নক্ষত্রগুলিও বহু দূরে আছে বলে' এত ছোট দেখায়। পণ্ডিতেরা বলেন, এক একটি নক্ষত্র এক একটি সূর্য্য। কোন নক্ষত্র আমাদের সূর্য্যের চেয়ে নয় কোটী গুণ বড়, আবার কোনটি আমাদের পৃথিবীর মতই ছোট। পৃথিবী থেকে সূর্য্যের দূরত্ব নয় কোটী ত্রিশ লক্ষ মাইল। সূর্য্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে আট মিনিট। আর যে নক্ষত্রটি আমাদের পৃথিবীর সব চেয়ে কাছে, তা' থেকে আলো আসতে লাগে চার বছরেরও বেশী। আলো চলে এক সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার চারশো মাইল। কাজেই পৃথিবীর সব চেয়ে কাছের তারাটির দূরত্বই হচ্ছে ৪ × ৩৬৫ × ২৪ × ৬০ × ৬০ × ১৮৬৪০০ মাইল। গুণটি তোমরা নিজেরাই ক'রে নিও।

তারাগুলো এত দূরে আছে বলেই আমরা তা' থেকে না পাই আলো, না পাই তাপ। শুধু ওদের এই মিট্‌মিটে জ্বলা-টুকুই আমাদের নজরে পড়ে।

তারা ছাড়া আরও একপ্রকার জ্যোতিষ্ক আকাশে আছে—জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতেরা তাদের নাম দিয়েছেন গ্রহ। আমাদের

এই পৃথিবীও একটি গ্রহ। এ পর্য্যন্ত আমরা নয়টি গ্রহের সন্ধান পেয়েছি—তাদের নাম বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস্, নেপচুন, প্লুটো। কাজেই পৃথিবীকে যদি জননী বলতে আমাদের আপত্তি না থাকে তবে আমাদের আটটি মামা মাসী আছে। পৃথিবীর মত আমাদের এই সাত জন মামা মাসীও সূর্য্যের চারদিকে লাটিমের মত ঘুরপাক খাচ্ছে!

রাতের আকাশ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা এতক্ষণ চাঁদের কথাই বলিনি। আমাদের ছোটবেলায় আমরা সবাই হাত বাড়িয়ে চাঁদ ধর্‌তে চেষ্টা করেছি, আর মা ছড়া কেটে চাঁদকে ডেকেছেন—

"আয় আয় চাঁদ মামা টিপ দিয়ে যা,
সোনার খুকুর কপালে মোর চুমো খেয়ে যা।"

চাঁদ দেখতে এত সুন্দর হ'লেও বাস্তবিক এ মোটেই সুন্দর নয়। মরুভূমির মত এ রুক্ষ। এতে না আছে প্রাণী, না আছে গাছপালা, না আছে কিছু! চাঁদ হচ্ছে পৃথিবী-গ্রহের একটি অনুচর। পণ্ডিতেরা এসব অনুচরদের নাম দিয়েছেন উপগ্রহ। কাজেই চন্দ্র পৃথিবী-গ্রহের একটি উপগ্রহ। গ্রহগুলি যেমন সূর্য্যের চারদিকে ঘুরে, চাঁদও তেমনি পৃথিবীর চারদিকে প্রদক্ষিণ ক'রে বেড়াচ্ছে।

পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব মোটে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মাইল। পৃথিবীর এত কাছে বলেই একে এত বড় দেখায়।

চন্দ্র যেমন পৃথিবীর উপগ্রহ, মঙ্গল গ্রহের তেমনি দুইটি, বৃহস্পতির নয়টি, শনির নয়টি, ইউরেনাসের চারটি এবং নেপচুনের একটি উপগ্রহ আছে।

উপগ্রহ, গ্রহ ও সূর্য্য নিয়ে এই যে জগৎ, পণ্ডিতেরা এর নাম দিয়েছেন সৌরজগৎ। সূর্য্যই হচ্ছেন এই জগতের রাজা। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বলেন, রাজা হয়েও সূর্য্য চুপ ক'রে বসে' নেই। তিনিও তাঁর চর, অনুচর নিয়ে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় দেড়শত মাইল বেগে মহাশূন্যে ভ্রমণ করছেন।

এগুলি ছাড়াও আকাশে আর একরকম খেয়ালী জ্যোতিষ্ক মাঝে মাঝে দেখা যায়—তাদের নাম দেওয়া হয়েছে ধূমকেতু। আমাদের ছোটবেলায় আমরা একবার একটা ধূমকেতু দেখে-ছিলাম। প্রকাণ্ড মাথার সাথে বিরাট লম্বা এক লেজ—এই হ'ল ধূমকেতুর চেহারা। পণ্ডিতেরা বলেন, ধূমকেতুর মাথাটা জড়পিণ্ডে তৈরী, আর লেজটা হাল্‌কা গ্যাসে ভরা।

ধূমকেতু আমরা কালে ভদ্রে দেখতে পাই, কিন্তু আকাশের গায় তারা-খসা একরকম নিত্যকার ব্যাপার। আকাশের দিকে চেয়ে আছ, হঠাৎ একটা তারা যেন আকাশের গা থেকে খসে' গেল। বাস্তবিক, এগুলি তারা নয়; এগুলিকে বলে উল্কা।

পাথর, লোহা, নিকেল ইত্যাদি দিয়ে এগুলি তৈরী। কলিকাতার যাদুঘরে গেলে এরূপ অনেক উল্কা তোমরা দেখতে পাবে।

এই উল্কাপিণ্ডগুলি আকাশে ছুটোছুটি করতে করতে যখন বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে আসে তখন এরা জ্বলে' উঠে—তাই এদের আমরা তারার মত উজ্জ্বল দেখতে পাই।

এতক্ষণ শুধু খালি চোখের দেখাই দেখলাম। এখন দূরবীণের ভিতর দিয়ে আকাশের দিকে চাইলে সাদা উজ্জ্বল কতকগুলি জ্যোতিষ্ক আমাদের নজরে পড়ে। এদের নীহারিকা বলা হয়। নীহারিকা শুধু গ্যাস বা খুব ছোট ছোট জড়কণায় তৈরী, তাই এদের কোন নির্দ্দিষ্ট আকার নেই। এই নীহারিকা-গুলির কোন কোনটি আমাদের সূর্য্যের চেয়ে কোটী গুণ বড়। আমাদের সৌরজগতের মত হাজার দুই সৌরজগৎ এদের ভিতর অনায়াসে লুকিয়ে থাকতে পারে। এসব বড় নীহারিকাদের একটা বিশেষত্ব এই যে, এদের আকার কুণ্ডলীপাকানো। —অনেকটা স্প্রিংএর মত।

আকাশের জ্যোতিষ্কদের যে-সব খবর পণ্ডিতেরা গবেষণা ক'রে বা'র করেছেন তা' থেকে দেখা যায়—বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমাদের এই পৃথিবীর মত আরও বহু পৃথিবী আছে। সে সবের কথা এখন থাক্—আমাদের পৃথিবীর কথায়ই আবার ফিরে আসা যাক্।

তোমাদের বলেছি, গ্রহ-উপগ্রহ সবই লাটিমের মত নির্দ্দিষ্ট পথে ঘুরছে। অথচ এরা নির্দ্দিষ্ট পথ ছেড়ে যায় না কেন তা' একটা রহস্যের মত মনে হয়। যদি একটা সূতার এক মাথায় একটা ঢিল বেঁধে, আর এক মাথা আঙ্গুলে জড়িয়ে চারদিকে
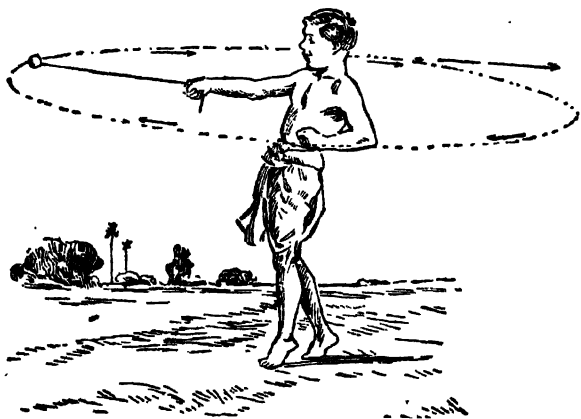
ঘুরান যায়, তবে ঢিলটি বোঁ বোঁ ক'রে বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে, সূতার টানের জন্য বৃত্তের বাইরে যেতে পারে না।

পৃথিবীর উপরও সূর্য্যের এমনি আকর্ষণের ফলে পৃথিবী তার কক্ষপথ ছেড়ে অন্য কোন পথে ঘুরতে পারে না। চন্দ্রের উপরও পৃথিবীর এমনি আকর্ষণ আছে এবং তারই ফলে চন্দ্রেরও পৃথিবীর চারদিকে না ঘুরে উপায় নেই। এই যে আকর্ষণ —এর নাম মাধ্যাকর্ষণ। জগতের সমুদয় জিনিষই পরস্পর

পরস্পরকে এভাবে আকর্ষণ করে। আপেল ফল মাটিতে পড়ছে দেখে নিউটন এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কার করেন। অবশ্য আমরা শুধু মাধ্যাকর্ষণের নিয়মগুলি জানি, কিন্তু এই আকর্ষণের হেতু কি, অন্যান্য অনেক রহস্যের মতই এও রহস্যই রয়ে গেছে। যাক্ সে কথা।

পৃথিবীর জন্ম-সম্বন্ধে আগের দিনে নানা আজগুবি ধারণা ছিল। সে-সব কাহিনী বাদ দিয়ে আমরা পরবর্ত্তীকালের পণ্ডিতদের মতামতের কথাই তোমাদের বলব। বহু চিন্তা ভাবনার পর শ' দেড়েক বছর পূর্ব্বে জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতেরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন যে, সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় সূর্য্য, চন্দ্র, তারা ইত্যাদি কিছুই ছিল না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শুধু নীহারিকা বা অগ্নিময় বায়ুতে ভরা ছিল। এই জ্বলন্ত বায়ুমণ্ডলের আকার ছিল গোল।

এই মাত্র যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কথা বলা হ'ল, তার ফলে নীহারিকার অণু পরমাণুগুলি পরস্পরকে নিজের কাছে টানতে চায়। ফলে বায়ুর তালটি ক্রমেই সঙ্কুচিত হ'তে থাকে এবং উহা লাটিমের মত কেবলই ঘুরপাক খেতে থাকে। একটা গোল জিনিষ যখন ঘুরতে থাকে তখন তার আকার চ্যাপ্টা হ'তে সুরু হয় এবং ঘুরার গতিবেগও বাড়তে থাকে। শেষে এর মাথার দিকে খানিকটা অংশ ছিট্‌কে খসে' যায়।

এভাবে কুণ্ডলীপাকানো নীহারিকার সৃষ্টি হয় এবং সেই নীহারিকার প্যাঁচের জায়গায় জায়গায় বায়বীয় পদার্থ জমাট বেঁধে নক্ষত্রের জন্ম হয়। জন্মের পর নক্ষত্রগুলি চুপ ক'রে থাকে না, তারা অনন্ত আকাশে বিষম বেগে ছুটোছুটি সুরু করে। এভাবে ছুটোছুটি করতে করতে যখন দু'টি নক্ষত্র পরস্পর খুব কাছে আসে তখন বড়টির আকর্ষণে ছোটটির গা থেকে কতক অংশ ছিঁড়ে যায়। নক্ষত্রের এই ছেঁড়া অংশটির আকার অনেকটা প্রকাণ্ড সিগারের মত। ক্রমে ক্রমে ঠাণ্ডা হ'তে হ'তে এ থেকেই পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। আর নক্ষত্রের বাকী অংশটি আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে হয়ে আমাদের সূর্য্যের জন্ম দিয়েছে। এ থেকে দেখা যায়—আমাদের পৃথিবী প্রথমে ছিল তরল তপ্ত গ্যাস—ক্রমে ক্রমে তা' ঠাণ্ডা হয়ে হয়ে আমাদের বর্ত্তমান পৃথিবীতে পরিণত হয়েছে। পৃথিবীর উপরিভাগ শক্ত হ'লেও এর ভেতরে যে এখনও তরল পদার্থ আছে, আগ্নেয়গিরির অস্তিত্ব থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। পণ্ডিতদের মতে প্রায় ১০০০,০০০০০০০ বৎসর আগে আমাদের এই পৃথিবীর জন্ম হয়েছে। এই মত অনুসারে নীহারিকাই সৌরজগতের সৃষ্টির মূল বলে' এই মতবাদ 'নীহারিকাবাদ' বলে' পরিচিত। ইংরেজীতে একে বলা হয় Nebular Hypothesis.

সকল পণ্ডিতেরা আবার এই মতবাদে বিশ্বাসী নন। তাঁরা বলেন, নীহারিকা শুধু জ্বলন্ত গ্যাসে পূর্ণ নয়। হাইড্রোজেন গ্যাসে ভ্রাম্যমান কোটী কোটী উল্কা সমষ্টি দিয়ে নীহারিকার সৃষ্টি হয়েছে। এই সকল উল্কাপিণ্ড অবিরাম গতিতে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছে—একটি আর একটিকে ধাক্কা দিচ্ছে। ফলে কয়েকটা উল্কাপিণ্ড গ্যাসে পরিণত হচ্ছে, কয়েকটা গলে' যাচ্ছে, এবং গলে' যাওয়া অনেকগুলি উল্কাপিণ্ড তাল পাকাবার ফলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে।

সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহ ঠিক কি ভাবে সৃষ্টি হয়েছে এই মতবাদীদের কাছে তা' তেমন স্পষ্ট নয়। এদের কেউ কেউ বলেন, উল্কাপিণ্ডগুলি খেয়াল খুসী এদিক-ওদিক ছুটোছুটি ক'রে একটি আর একটিকে ধাক্কা মারে। আবার কেউ কেউ বলেন, একটা নির্দ্দিষ্ট পিণ্ডের চতুর্দ্দিকে এরা নির্দ্দিষ্ট কক্ষে ঘুরছে। যখনই একটি পিণ্ড আর একটি পিণ্ডের গতিপথে এসে পড়ে, তখনই শুধু এদের মধ্যে ধাক্কা-ধাক্কি সুরু হয়। আর তাতে যে তাপ উৎপন্ন হয় তাতে এরা গলে' যায়, এবং এই তরল পদার্থ ঠাণ্ডা হয়ে হয়েই এই পৃথিবীর সৃষ্টি হয়।

আমরা যে মতই বিশ্বাস করি না কেন, এটা ঠিক যে, আমাদের এই পৃথিবী আগে ছিল বাষ্পময়; ক্রমে ঠাণ্ডা হয়ে হয়ে তা' জমাট বেঁধে বর্ত্তমান আকার পেয়েছে।

আরও একটা কথা। খোকনমণিকে ঘুম পাড়াবার সময় যখন বলি,

"আয় আয় চাঁদ মামা টিপ্ দিয়ে যা,
সোনার খোকার কপালে মোর চুমো খেয়ে যা।"

অথবা শীতের দিনে নেয়ে উঠে' কাঁপতে কাঁপতে যখন ডাকি,

"সূর্য্য মামারে তোর ভাগ্নে শীতে মরে
রোদ তুলে দে।"—

তখন চন্দ্র-সূর্য্যের সঙ্গে আমাদের মাতুল সম্পর্ক স্থাপনটা ঠিক বিজ্ঞান সম্মত হয় না।

কেননা, বৈজ্ঞানিকদের মতে সূর্য্য হ'লেন আমাদের জননী বসুন্ধরার বাবা, নীহারিকা হ'ল ঠাকুর্দ্দা, আর আদিম বায়ুমণ্ডলী হ'ল ঠাকুর্দ্দার বাবা। বুধ, শুক্র প্রভৃতি গ্রহগণ আমাদের এই পৃথিবীর ভাই-বোন্, চাঁদ হ'ল পৃথিবীর ছেলে।

কাজেই চাঁদ হ'ল আমাদের ভাই, আর সূর্য্য হ'ল আমাদের ঠাকুর্দ্দা।

পণ্ডিতেরা ত' কোন রকমে পৃথিবীর জন্মকথা তৈরী করেছেন, কিন্তু এই জন্ম-কাহিনীর গোড়ার কথা অর্থাৎ আদিম বায়ুমণ্ডলীর সৃষ্টি কি ক'রে হ'ল, সে রহস্য আজও অনাবিষ্কৃতই রয়ে গেছে এবং চিরদিনই হয়ত রহস্যাবৃতই থাকবে।

সূর্য্যমামা নয় কোটী ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে থেকে তার ভাগ্নেদের উপর চোখ রাঙালেও সেয়ানা ভাগ্নেরা নানারকম যন্ত্রপাতির সাহায্যে নানা ফিকির ফন্দী ক'রে, মামার মাপ-জোখ জেনে নিয়েছে।

সে-সব সূক্ষ্ম হিসাব-নিকাশ করতে হ'লে অনেক দামী দামী যন্ত্রপাতি ও অনেক পরিশ্রম আবশ্যক। তোমাদের মত ক্ষুদে ভাগ্নেরাও যাতে মামার আয়তন বের করতে পার আজ তারই কায়দা শিখিয়ে দিচ্ছি।

জিনিষটি বুঝতে সামান্য একটু জ্যামিতি ও পাটীগণিতের সাহায্য লাগবে। তবে তেমন শক্ত কিছুই নয়। যারা ইস্কুলের উপরের ক্লাশে পড়, তাদের কাছে এটা মোটেই শক্ত মনে হবে না।

প্রথমেই চাই একখানা ভাল ফুটরুল। এখানা যত ভাল ও যত দামী হবে তোমার মাপ-জোখ ততই নির্ভুল হবে। সার্ভেয়াররা হাড়ের যে ছোট রুল ব্যবহার করেন তেমন হ'লেই সব চেয়ে ভাল হয়, আর তা' না পেলে সাধারণ ফুটরুলেও কাজ চলতে পারে।

বেলা নয়টা বা বিকেল তিনটেই হ'ল মামার দেহের পরিমাপ করবার সবচেয়ে ভাল সময়। তোমাদের বাড়ীর পূব বা পশ্চিমের ভিটীর ঘরের জানালায় খুব সরু একটা ছিদ্র কর, যার ভেতর দিয়ে সে সময় টাকার মত গোল রোদের আলো এসে মেঝেতে পড়ে। তারপর চেয়ারের উপর বই ঠেস দিয়ে এমনভাবে একখানা শক্ত সাদা কাগজ হেলান দিয়ে রাখ, যাতে রোদ এসে ঠিক খাড়াভাবে ঐ কাগজটার উপর পড়ে। সব সময় মনে রাখবে যে, জানালার ছিদ্রটি খুব ছোট হওয়া চাই, আর রোদটা ঠিক খাড়াভাবে কাগজের উপর পড়া চাই।

তারপর কাগজের রোদ-পড়া অংশে ছ'টি সমান্তরাল রেখা

(parallel lines) টেনে দাও। এখন চেয়ারটাকে আস্তে আস্তে এমনভাবে জানালার দিকে সরিয়ে আনবে যাতে গোলাকৃতি সূর্য্যরশ্মির দু'টি ধার ঠিক ঠিক সেই সমান্তরাল রেখা দু'টির সাথে মিশে যায়। তারপর জানালার ছিদ্র থেকে এই আলোকিত অংশের ঠিক মাঝখান অবধি দূরত্বটি নির্ভুল ভাবে মেপে নাও। সমান্তরাল রেখা দু'টির ব্যবধানও মাপ। ব্যস্, মাপ-জোখের কাজ হয়ে গেল। এখন সামান্য একটু আঁক কষলেই তোমরা মামার চওড়াটি (diameter) জানতে পারবে।

সমান্তরাল রেখা দু'টির ব্যবধানকে জানালার ছিদ্র থেকে কাগজের দূরত্ব দিয়ে ভাগ কর এবং ভাগ-ফলকে পৃথিবী থেকে মামার দূরত্ব দিয়ে গুণ কর। তা' হ'লেই মামার চওড়া টুকুন্ পাওয়া যাবে।

আমরা যে পরীক্ষা করেছিলাম তাতে জানালার ছিদ্র থেকে কাগজের দূরত্ব ছিল ১০ ফুট ৫'৪ ইঞ্চি অর্থাৎ ১২৫'৪ ইঞ্চি। কাগজের উপরকার সমান্তরাল রেখা দু'টির ব্যবধান ছিল ১'১৭৫ ইঞ্চি। আর আগেই বলেছি যে, পৃথিবী থেকে সূর্য্যের দূরত্ব ৯৩০০০০০০ মাইল। কাজেই মামা চওড়া হ'লেন $\frac{১'১৭৫ \times ৯৩০০০০০০}{১২৫'৪}$ অর্থাৎ ৮৭১০০০ মাইল। মাত্র পৌণে নয় লক্ষ মাইল! মামা খুব সরুই বলতে হবে, কি বল?

অবশ্য এ পরীক্ষার ফল পণ্ডিতদের গণনার চেয়ে সামান্য একটু বেশী হয়ে গেল। এ হবেই, কেননা আমাদের যন্ত্রপাতির মধ্যে শুধু একটা ফুটরুল। আর এ. সামান্য জিনিষটি দিয়েই যে এতটা ভাল ফল পাওয়া গেল, এও কি আর কম বাহাদুরি !

তোমরাও নিজহাতে একবার মামার মাপ-জোখ ক'রে দেখ না !

তোমার মা আদর ক'রে তোমার হাতে একটি চমৎকার খাবার তুলে দিলেন, তুমিও সেটি মুখে পূরতে যাচ্ছ, এমন সময় মুখপোড়া একটা কাক যদি আচমকা তোমার হাত থেকে তা' নিয়ে পালায়, তখন আশা-ভঙ্গের মনস্তাপে তুমি হয়ত তুনিয়ার সব কাককেই একেবারে শেষ করতে চাইবে!

খাবার কেড়ে নেওয়া কেন, হতভাগাগুলো যখন বিশ্রী গলায় একটানা ডাক ডেকে কাণ ঝালাপালা ক'রে তুলে, তখন কি মনে হয় না যে তুনিয়ায় কাকের অস্তিত্ব না থাকলেই হ'ত ভাল!

শুধু কাক কেন, শকুন, চিল, মশা, মাছি, বোল্‌তা, আরশুলা, সাপ, ব্যাঙ্‌—এমনি যে সব প্রাণী শুধু আমাদের ক্ষতি করে বলেই আমাদের ধারণা, তাদের কাউকেই আমরা তু'চোখে দেখতে পারি কি?

বাস্তবিক, কোন-না-কোন সময় কোন-না-কোন প্রাণী সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যেকেরই মনে হয় যে, দুনিয়ার বুক থেকে এগুলি একবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেই বোধ হয় আরামে থাকতে পেতাম। কিন্তু সত্যি কি তাই হ'ত?

শকুনের কথাই ধর। হঠাৎ কোন যাদুমন্ত্রে যদি একদিন পৃথিবীর সব শকুন শেষ হ'য়ে যেত তবে কি হ'ত? মরা গরু, মরা ঘোড়া, মরা মোষ ভাগাড়ে ফেলতে না ফেলতেই এগুলি খাবার জন্য আর শকুনের ভিড় জমত না! ফলে মরা পশুগুলি দিনের পর দিন পচে পচে যা' একটি চমৎকার সুগন্ধের সৃষ্টি করত তা' আর বলে কাজ নেই! সে গন্ধ যে শুধু অসহ্য হ'ত তা' নয়, তাতে বাতাস দূষিত হয়ে নানা ব্যারামের সৃষ্টি হ'ত! কাজেই দেখ, এই যে বিশ্রী শকুন, যাদের দেখলেই ঘেন্না হয়— এরা না থাকলেও আমাদের জীবন কতখানি বিপন্ন হ'ত।

মানুষ বুদ্ধির বড়াই ক'রে সাময়িক সুবিধার আশায় কোন কোন জায়গায় কোন কোন প্রাণীকে ধ্বংস করবার জন্য চেষ্টা করেছে। কিন্তু প্রকৃতি তার বিধি ব্যবস্থার উপর মানুষের এই অনধিকার চর্চ্চা সইবে কেন? তাই প্রথম প্রথম এমন ধারা চেষ্টার সুফল ফলছে মনে ক'রে মানুষ যখন আপন কৃতিত্বের বড়াই করতে থাকে প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নিতে সুরু করে! তখন মানুষের অবস্থা হয়, 'ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি!'

বছর পঞ্চাশেক আগের কথা। উত্তর আমেরিকার জ্যামেইকা দ্বীপে ইঁদুরের উৎপাত এক সময় এতটা বেড়ে গেল যে, ইঁদুরের অত্যাচারে চাষীদের আখের চাষ করাই দায় হয়ে উঠল। আখের চাষ জ্যামেইকার প্রধান কৃষি—তাই চাষীর দল, কি ক'রে এ উৎপাত কমান যায় তা' নিয়ে মাথা ঘামাতে সুরু করল !

বিড়ালের সংখ্যা বাড়াতে পারলে ইঁদুরের উৎপাত সহজেই দমন করা যায়। কিন্তু সেদিকে নানা অসুবিধা থাকায় অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে তারা স্থির করল যে, অন্য কোন দেশ থেকে গোটা কয়েক বেজী আমদানী করতে হবে। তোমরা হয়ত জান, বেজী সাপের ভয়ানক শত্রু। বেজীর হাতে পড়লে সাপের আর রক্ষা নেই। যেমন ক'রেই হোক্ সাপকে শেষ ক'রে তার মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে তবে বেজীর পরিতৃপ্তি। ইঁদুরের মাংসও বেজীর কম প্রিয় নয়। কাজেই বেজীর আমদানী করতে পারলে ইঁদুরের বিনাশ অনিবার্য্য !

একজন চাষী দক্ষিণ এসিয়া থেকে চারটি পুরুষ বেজী আর পাঁচটি মেয়ে বেজী এনে তার আখক্ষেতে ছেড়ে দিলে। ছ'মাস যেতে না যেতেই দেখা ;গেল, তার আখ ক্ষেতে আর ইঁদুরের তেমন উৎপাত নেই।

দেখাদেখি আর আর চাষীরাও বেজী আমদানী করতে সুরু

করলে। ফলে বেজীর সংখ্যা বছর দশেকের মধ্যে এত বেড়ে গেল যে, তারা প্রায় সমস্ত জ্যামেইকা দ্বীপেই ছড়িয়ে পড়ল। হিসেব ক'রে দেখা গেল যে, ইঁদুরের অত্যাচার কমে' যাওয়ায় জ্যামেইকার চাষীদের প্রায় ১৩ লক্ষ টাকার আখ লোকসানের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

কিন্তু এর উল্টা ফল ফলতেও দেরী হ'ল না। ইঁদুরের বংশ যখন একেবারেই ধ্বংস হয়ে গেল, তখন পেটের জ্বালায় বেজীর দল সাপ, টিকটিকি, ব্যাঙ্ এবং অবশেষে হাঁস, মুরগী ও অন্যান্য পাখী ধ'রে ধ'রে শেষ করতে লাগল। এমন কি বিড়ালের বাচ্চা, কুকুরের বাচ্চা, শূয়োরের বাচ্চা, ছোট বাছুরও এদের হাত থেকে রেহাই পেল না। তা' ছাড়া সুবিধামত ফল মূল দিয়ে জলযোগ করা ত' হাতের পাঁচ হয়েই রইল।

ফলে, এক বিপদের হাত থেকে রেহাই পেতে গিয়ে আর এক ফ্যাসাদ ডেকে আনা হ'ল। কারণ যে-সব পাখী বেজীর পেটে যেতে সুরু করল, তাদের অনেকের খাদ্য ছিল এক রকম পোকা যা' ফসলের ভয়ানক ক্ষতি করে! এখন সে সব পাখী না থাকায়, পোকার উপদ্রব সাংঘাতিক বেড়ে গেল। চাষীরা আবার মাথায় হাত দিয়ে বসল—যে সর্ষে দিয়ে তারা 'ইঁদুরের ভূত' তাড়াবার ব্যবস্থা করেছিল, সে সর্ষেই যে এমনভাবে 'পোকার ভূত' হয়ে তাদের এমন সর্ব্বনাশ করবে তা' আর

১। জ্যামেইকা দ্বীপে ইঁদুরের
উপদ্রব দূর করার জন্য
বেজীর আমদানী করা হল
২। কয়েক বছরের মধ্যেই
তারা ইঁদুরের বংশধ্বংস
করে দিলে
৩। পেটের খিদায় বেজীরদল পাখী মুরগীপ্রভৃতি
শিকার করতে লাগল
৪। পাখী টিকটিকি কমে
যাওয়ায় পোকার উৎপাত
বেড়ে গেল
৫। পোকাগুলি মনের সুখে
ফসল নষ্ট করতে-লাগল
৬। অবশেষে এক একটী বেজী
মারবার জন্য এক এক শিলিং
পুরস্কার ঘোষণা করা হ

তারা আগে কি ক'রে জানবে! তাই তারা এখন বেজীর নিকুচি করার দিকে মন দিলে। ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হ'ল, যে একটা বেজী মেরে আনতে পারবে, সে-ই এক এক শিলিং পুরস্কার পাবে। এ ভাবে বেজীবধ যজ্ঞ সমাপ্ত হ'লে তবে জ্যামেইকায় আবার শান্তি ফিরে এল।

এডেনেও একবার এমনি ধরণের ব্যাপার ঘটেছিল। কিছুদিন আগে সেখানে ইঁদুরের ভয়ানক প্লেগ হ'তে সুরু হয়। প্লেগ যাতে সংক্রামক হয়ে মহামারী আকার ধারণ না করতে পারে সেজন্য ইঁদুর মারবার জন্য সেখানে দেশান্তর থেকে শত শত বিড়াল আমদানী করা হ'ল। বিড়ালের মুখে ইঁদুরের আয়ু আর ক'দিন? ইঁদুর শেষ হ'লে, বিড়ালের দল সমুদ্রের ধারে হানা দিলে।—সেখানে তারা কাঁকড়া আর মাছ ধ'রে ধ'রে খেতে সুরু করলে। যাহোক্, এডেন নেহাৎ কাঠখোট্টা গোছের জায়গা, কাজেই বিড়ালেরা সেখানে আর বিশেষ কোন উৎপাত করতে পারেনি। নতুবা সেখানেও আবার কোন্ সমস্যার উদয় হ'ত, কে জানে?

মানুষই যে সব সময় সখ ক'রে বা ইচ্ছে ক'রে একদেশ থেকে আর এক দেশে নানা প্রাণী আমদানী করে তা' নয়। বড় বড় জাহাজ ত' সদাসর্ব্বদাই এক দেশ থেকে আর এক দেশে যাতায়াত করছে। বহু ইঁদুর বিড়াল সুবিধা পেলেই

কাপ্তেনকে ফাঁকি দিয়ে বিনা ভাড়ায় দেশ-দেশান্তরে বেড়িয়ে বেড়াবার লোভ সামলাতে পারে না। এমনি ক'রে কোন কোন জায়গায় ইঁদুর বিড়ালের সংখ্যা এত বেশী বেড়ে যায় যে, তখন তাল সামলানো দায় হয়ে উঠে।

এমনি ক'রেই লাব্রাডার উপদ্বীপে একবার ইঁদুরের সংখ্যা এত বেড়ে গেল যে, তাদের উৎপাতে সেখানকার বল্গা হরিণগুলো দলে দলে দেশ ছেড়ে পালাতে সুরু করলে। কারণ ইঁদুরের দল সমস্ত ঘাসের জমির উপর এমন একচ্ছত্র রাজত্ব সুরু করল যে, সে সমস্ত নোংরা জমিতে আর সৌখীন বল্গা হরিণের চ'রে খাবার সুবিধা রইল না।

যাহোক্, প্রকৃতি নিজ থেকেই এর সংশোধন করবার চেষ্টা করলেন। ইঁদুরের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় যে-সব প্রাণী ইঁদুর খেতে ভালবাসে—যেমন, বাজ, বন-বিড়াল, খেঁকশিয়াল, নেকড়ে বাঘ—ইত্যাদি পশু-পক্ষীর সংখ্যা দেখতে দেখতে বেড়ে গেল। ফলে এদের কবলে প'ড়ে ইঁদুরদের অক্কা পেতেও বেশী দেরী হ'ল না।

ইঁদুরের উৎপাত কমতেই, বল্গা হরিণের দল আবার লাব্রাডারে ফিরে আসতে সুরু করলে। কিন্তু এবার এখানে এসেও তারা স্বস্তি পেল না। নেকড়ে বাঘের সংখ্যা এর মধ্যে ঢের বেড়ে গেছে, অথচ সে অনুপাতে এদের অন্য খাবার

বাড়ে নি, কাজেই তারা এখন থেকে বন্যা হরিণ ধ'রে ধ'রে খেতে লাগল। তাই বন্যা হরিণের দল প্রাণভয়ে আবার নিরাপদ স্থানের সন্ধান দেখতে স্থুরু করলে।

কত সহজে যে প্রকৃতির স্বাভাবিক ব্যবস্থার বিষম ব্যতিক্রম ঘটতে পারে ম্যাডাগাস্কার দ্বীপেও কিছুদিন পূর্ব্বে এর পরিচয় পাওয়া গেছে। সেখানকার কয়েকজন লোকের খেয়াল হ'ল যে, তাদের নদীতে গোটাকতক সোনালী মাছ (gold fish) ছেড়ে নদীর শোভা বাড়াবে। সোনালী মাছগুলি দেখতে ভারী স্থন্দর, তাদের আঁশগুলির রং ঠিক কাঁচা সোনার মত এবং সোনার মতই সেগুলি চিক্‌চিক্ করে! সখের খাতিরে চৌবাচ্চার জলে অনেকে এ মাছ পুষে থাকেন।

নদীতে ত' এ মাছ কতকগুলি ছাড়া হ'ল। কিন্তু তুর্ভাগ্যের বিষয় যে, বড় নদীর অথৈ জলে ছুটোছুটি করবার স্থবিধে পেলে এদের রংএর সে শোভা আর থাকে না। তখন এদের সোনালী রং ধূসর হয়ে যায়। ম্যাডাগাস্কারেও তাই হ'তে বড় বেশী দিন লাগল না। ফলে নদীর জলের শোভা বৃদ্ধি চুলোয় যাক্, উল্টো এরা অন্যান্য ছোট ছোট মাছ ধ'রে উদরস্থ করতে স্থুরু করলে। লাভের মধ্যে এই হ'ল, যে-সব মাছ আগে মানুষের ভোগে লাগত, তাদেরই হ'ল অভাব। কোন কোন নদীতে ত' এখন এমন হয়েছে যে, এই পিঙ্‌লা

রংএর সোনালী মাছ ছাড়া অন্য কোন মাছই পাওয়া যায় না! একেই বলে 'হিতে বিপরীত!'

এ ত' শুধু কয়েকটা জায়গার কথা বলা হ'ল। এমনি আরও নানা জায়গার নানা কাহিনী আছে। কিন্তু সব জায়গায়ই একটা জিনিষ দেখা যায় যে, প্রকৃতির ব্যবস্থার উপর হাত পড়লে প্রকৃতি তা' সহজে মেনে নিতে রাজী হন না। তাঁর উপর মাতব্বরি করতে গেলে তিনিও মানুষের উপর বেশ এক হাত নিয়ে নেন। অর্থাৎ প্রকৃতির এই যে স্বাভাবিক ব্যবস্থা, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় Balance of Nature, তার ওলট-পালট করতে গেলেই নানা বিপর্য্যয় ঘটে!—যাতে পরিণামে আমাদের হিতের চেয়ে অহিতই বেশী হয়।

আরও একটা কথা জানতে পারি। সেটা হচ্ছে এই, আমরা আমাদের আশে-পাশে এই যে ছোট-বড় জীবজন্তু দেখতে পাই, এদের কোনটাই নিরর্থক নয়। এরা সোজাসুজি আমাদের কোন উপকার করেনা বটে, কিন্তু যারা আমাদের সত্যই উপকারী তাদের সহিত এদের একবারে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। কাজেই তোমার চোখের সুমুখের বিশ্রী কাক, বেয়াড়া মশা, নোংরা মাছি—কোনটাই বিনা প্রয়োজনে নেই! তবে এদের সকলের প্রয়োজন আমরা চট্ ক'রে বুঝতে পারিনে, এই যা!

আবিষ্কারের কথা

গুপ্তধনের সন্ধান লাভ ক'রে কেউ কেউ হঠাৎ বড়মানুষ হয়ে গেছেন এ কথা তোমরা শুনে থাকবে; লটারীর টাকা পেয়েও অনেকে রাতারাতি বড়লোক হয়ে যান, এ ত' তোমরা চোখের উপরই দেখতে পাচ্ছ। তেমনি বিজ্ঞানের রাজ্যেও অনেক গুপ্ত তথ্য দৈবযোগে হঠাৎ আবিষ্কার ক'রে অনেক বৈজ্ঞানিক জগজ্জোড়া খ্যাতি লাভ করেছেন। আজ তোমাদিগকে তারই গল্প বলব।

মাধ্যাকর্ষণ

নিউটনের নাম তোমরা সকলেই শুনে থাকবে। তিনি একজন খুব বড় পণ্ডিত ছিলেন এবং অনেক মূল্যবান্ বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার ক'রে বিজ্ঞানজগতে অমর হয়ে রয়েছেন। মাধ্যাকর্ষণ তাঁরই আবিষ্কার।

নিউটন যখন ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপক, সে সময় একবার হঠাৎ সেখানে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় ছুটী দেওয়া হয় এবং যে যাঁর মত দেশে চলে যান। নিউটনও ছুটী কাটাবার জন্য ক্যাম্ব্রিজ ছেড়ে পল্লীগ্রামে গিয়ে বাস করতে থাকেন।

একদিন তিনি বাগানে বসে' একখানা গণিতের বই পড়ছেন, আর মাঝে মাঝে উপরের দিকে চেয়ে কি ভাবছেন, এমন সময় হঠাৎ একটা আপেল ফল গাছ থেকে খসে' টুপ্ ক'রে মাটীতে পড়ল।

এ অতি সাধারণ ঘটনা। যারা পাড়াগাঁয়ে থাকে তারা ত' রোজই দেখে, পেকে গেলে সব ফলই গাছ থেকে মাটীতে খসে' পড়ে। কিন্তু নিউটনের চোখে এ সাধারণ জিনিষটিই অসাধারণ হয়ে দেখা দিল। তিনি ভাবতে লাগলেন, আকাশের দিকে উড়ে' না যেয়ে ফলটা মাটীতে পড়ল কেন?

দিন-রাত ভাবতে ভাবতে তিনি শেষে বের করলেন যে,

পৃথিবী সমস্ত জিনিষকেই তার কেন্দ্রের দিকে টান্‌ছে এবং সেই আকর্ষণের জন্যই কোন জিনিষ উপরের দিকে ছুঁড়ে দিলেও তা'

মাটীতেই ফিরে আসে। শুধু এই টুকুই নয়, নিউটন শেষে অনেক রকম ক'রে প্রমাণ করেন যে, পৃথিবীর সব জিনিষই

একে অন্যকে আপনার দিকে টান্‌ছে। কেম্ব্রিজে প্লেগ না লাগলে তিনি সে সময় মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করতেন কিনা তা' এখন বলা শক্ত।

কাপড়-কাচা নীল

তোমাদের মধ্যে যাদের বাড়ী পূর্ব্ব বাংলায়, তারা দেখে থাকবে নদীর ধারে এখানে সেখানে নীলকর সাহেবদের অনেক ভাঙ্গা কুঠী প'ড়ে আছে। এদের নীলকুঠী বলা হয়। সে সময় এ দেশে নীলের চাষ হ'ত এবং নীল তৈরী ক'রে দেশ-বিদেশে চালান দেওয়া হ'ত। কি ভাবে একটা আকস্মিক ঘটনায় এ ব্যবসায়টা বিদেশীর হাতে চ'লে যায় তা'ই বলছি।

সে সময় আমাদের দেশ ছাড়া আর কোথাও বড় নীল তৈরী হ'ত না, আর দামও একটু বেশী পড়ত। তাই জার্ম্মেণীর কয়েকজন বৈজ্ঞানিক কৃত্রিম উপায়ে নীল তৈরী করবার চেষ্টা সুরু করলেন। তাঁরা নানারকম পরীক্ষা ক'রে বের করলেন যে, ন্যাপথলিন ও সাল্‌ফিউরিক্ এসিড্ এক সাথে মিশিয়ে আগুনের তাপে সিদ্ধ করলেই তা' থেকে শেষে নীল তৈরী করা যায়। কিন্তু কাজটি বড় সহজ ছিল না; এতে বড় বেশী সময় নষ্ট হ'ত। তাই এটা যাতে সহজে করা যায়, জার্ম্মাণ রাসায়নিক বেয়র তার জন্য নানারকম পরীক্ষা করতে থাকেন।

বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁর কোন চেষ্টায়ই কোন ফল হয় নাই। শেষে একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে তিনি এ বিষয়ে সাফল্য লাভ করেন। পরীক্ষার সময় তাপ মাপবার জন্য একটা থার্ম্মোমিটার ব্যবহার করতে হয়েছিল, আর তা' দিয়েই আবার ন্যাপথলিনকে নাড়াচাড়াও করতে হ'ত। একদিন হঠাৎ একটু অসাবধান হ'তেই থার্ম্মোমিটারটি ভেঙে তার ভেতরের পারাটুকু এদের সাথে এসে মিশল। পারার ছোঁয়াচ লাগতে না লাগতেই ন্যাপথলিন আর সালফিউরিক্ এসিড্ অতি সহজেই মিশে গেল। এতদিন এত চেষ্টা ক'রেও যা সম্ভব হয়নি, একটু অসাবধানের ফলে তা' অনায়াসেই হয়ে গেল। পারাটুকুর অবশ্য কোন পরিবর্ত্তন হ'ল না—যেমন তেমনই থাকল। রসায়নের ভাষায় এমন সব জিনিষকে Catalytic agent বলা হয়।

এ ভাবে নীল তৈরী আবিষ্কার হওয়ার সাথে সাথেই নীলের দাম ভয়ানক সস্তা হয়ে গেল, আর ওদেশে এত নীল তৈরী হ'তে লাগল যে, আমাদের দেশের এই একচেটিয়া ব্যবসায়টি দেখতে দেখতে অল্পদিনের মধ্যেই একেবারেই নষ্ট হয়ে গেল। অথচ এই সব বিরাট ব্যাপারের গোড়ায় রয়েছে সামান্য একটা থার্ম্মোমিটার ভাঙা!

রং

আজকাল জার্ম্মেণীর রং জগতের বাজার দখল ক'রে বসেছে। এ ব্যবসায়ে আজ জার্ম্মেণী বছর বছর কোটী কোটী টাকা রোজগার করছে। এই রং তৈরীর ইতিহাসও এমনি একটা আকস্মিক ঘটনার উপর ভিত্তি ক'রেই গ'ড়ে উঠেছিল।

আজকাল যে সকল রং বাজারে চল্‌তি, তার অধিকাংশই আল্‌কাতরা থেকে তৈরী। এমন মিশমিশে কালো কুৎসিৎ জিনিষ থেকে যে যাদুকর এমন সুন্দর সুন্দর রং তৈরী করার উপায় আবিষ্কার করেছিলেন তাঁর নাম উইলিয়ম হেন্‌রী পার্‌কিন।

ম্যালেরিয়া জ্বরে কুইনাইন ব্যবহার হয় তা' তোমরা জান। সিন্‌কোনা নামক এক রকম গাছ থেকে কুইনাইন তৈরী হয়। পারকিন্ প্রথমে আল্‌কাতরা থেকে কুইনাইন বের করা যায় কিনা তারই চেষ্টা সুরু করেন। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হ'তে না পেরে তাঁর ঝোঁক যেন আরও বেড়ে গেল।

ইষ্টারের ছুটীতে একদিন বাড়ীতে বসে' কুইনাইন তৈরী করার নিষ্ফল চেষ্টায় সারাটি দিন নষ্ট ক'রে তিনি তাঁর পরীক্ষাগৃহ থেকে বেরুবার সময় লক্ষ্য করলেন যে, যে পাত্রটিতে ক'রে তিনি তাঁর পরীক্ষার কাজ করেছিলেন তার তলায় খানিকটা কালো জিনিষ জমে' আছে। কোন কাজে লাগবে না

ভেবে তিনি সেটা ফেলে দিতে যেয়েও থেমে গেলেন এবং হঠাৎ কি ভেবে তাতে একটু সুরাসার (alcohol) ঢেলে দিলেন। অমনি এক আশ্চর্য্য ব্যাপার! গ্লাসের ভেতরের সমস্ত কালো জিনিষটা দেখতে দেখতে যেন ইন্দ্রজালের মত বদলে যেয়ে ফিকে বেগুনী হয়ে গেল। হঠাৎ একটা খেয়ালের মাথায় যা ঘটে' গেল, তা'ই বর্ত্তমান রংএর ব্যবসায়ের গোড়াপত্তন!

ষ্টীম এঞ্জিন

রেল, ষ্টীমার, কল-কারখানা অনেক কিছুই আজকাল বাষ্পে চলে এ তোমরা সবাই জান। এই বাষ্পকে এমন ভাবে মানুষের কাজে খাটাবার ফন্দীটা কার মাথায় প্রথম এসেছিল তা' জান কি? তাঁর নাম জেমস্ ওয়াট্। একদিন তিনি চা খাবার আশায় বসে আছেন, সুমুখেই একটা কেট্‌লীতে চায়ের জল সিদ্ধ হচ্ছে। জল যখন টগ্‌বগ্ ক'রে ফুটতে সুরু করেছে, তখন সচরাচর যা হয়ে থাকে, তা'ই তাঁর নজরে পড়ল। তিনি দেখলেন যে, বাষ্পের চাপে কেট্‌লীর ঢাকনাটা এক একবার উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে, আর তারই ফাঁক দিয়ে হুস্ হুস্ ক'রে বাষ্প বেরিয়ে আসছে। অমনি তাঁর মাথায় এল যে, জলীয় বাষ্পকে যদি কোন কায়দায় আটকে রাখা যায় তবে তা' দ্বারা অনেক কাজ হ'তে পারে। তাই থেকে তিনি ষ্টীম এঞ্জিন

তৈরীর পরিকল্পনা করলেন। সত্যি, সাধারণ ব্যাপার থেকে কত অসাধারণ জিনিষই না হয়ে থাকে !

বসন্তের টীকা

বসন্তের টীকার ইতিহাসও এমনি আশ্চর্য্যের। এড্ওয়ার্ড জেনার নামক একজন ডাক্তার ডাক্তারী পাশ করার পর প্রথম কয়েক বছর আর একজন নামকরা ডাক্তারের সহকারী হিসাবে কাজ করেছিলেন। এ সময় তাঁকে রোজই বহু রোগী দেখে তাদের ঔষধ দিতে হ'ত। একদিন সর্দ্দির ঔষধ নেবার জন্য এল একটি অশিক্ষিতা পাড়াগাঁয়ে মেয়ে। সে সময় খুব বসন্তের ধূম লেগে গেছে। জেনার কথায় কথায় তাকে প্রশ্ন করলেন, বসন্তের জন্য তার ভয় হয় কি না। মেয়েটি একটু হেসে উত্তর দিলে—'আমার যে একবার গো-বসন্ত হয়ে গেছে, আমার ত' আর বসন্ত হবার ভয় নেই।' তখনকার দিনে অনেকেরই বিশ্বাস ছিল যে, একবার বসন্ত হ'লে আর তার বসন্ত হ'তে পারে না। আমাদের দেশের পাড়াগাঁয়ে এখনও এ কুসংস্কার একটু আধটু আছে।

মেয়েটির কথা শুনে জেনারও হাসলেন বটে, কিন্তু তখন থেকেই তিনি ভাবতে লাগলেন, নিশ্চয়ই এর মূলে কিছু না কিছু সত্য আছে। তারপর এ নিয়ে তিনি রাত-দিন পরীক্ষা সুরু

করলেন। প্রথমতঃ কতজন তাঁকে কত রকমে উপহাস করত, কিন্তু জেনার তাতে মোটেই না দমে' আপন মনে নানা রকম পরীক্ষা ক'রে শেষে দেখিয়ে দিলেন যে, গো-বসন্তের বীজের (Vaccine) টীকা নিলে সত্যি সত্যিই বসন্তের ভয় থাকে না।

একটি অশিক্ষিতা পাড়াগাঁয়ে মেয়ের কথায় ডাক্তার জেনারের জীবনের কর্ম্মধারা একেবারে বদলে গেল, আর তারই ফলে আজ কোটী কোটী লোক বছর বছর এ মারাত্মক ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে !

রঞ্জন রশ্মি

'এক্স-রে' বা রঞ্জন রশ্মির আবিষ্কারও একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবেই হয়েছিল। অধ্যাপক রণ্ট্‌জেন একটা বায়ুশূন্য কাচের নলের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিয়ে একটা পরীক্ষা করেছিলেন—বিদ্যুৎ চলাচলের সময় এক একটা স্পার্ক (spark) দিচ্ছিল, আর সুন্দর রং বেরংএর আলো বেরুচ্ছিল।

সে ঘরেই একটা বন্ধ করা কাঠের বাক্সে কতকগুলো ফটোর প্লেট ছিল। অধ্যাপক রণ্ট্‌জেন তা' খুলতে গিয়ে দেখেন যে তা' একেবারে নষ্ট হ'য়ে গেছে। তিনি এতে একবারে অবাক্ হ'য়ে যান, কেন না, আলো না লাগা পর্য্যন্ত

ফটোর প্লেটগুলি অবিকৃত থাকার কথা। কিন্তু তা' যখন রয়নি তখন যে ক'রেই হোক্ এরা আলোর সংস্পর্শে এসেছে। কিন্তু এ আলো এল কোত্থেকে ? তিনি ভাবতে সুরু করলেন, এবং ভেবে ভেবে বের করলেন যে, বায়ুশূন্য কাচের নলের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ চলাচল করলে তা' থেকে যে আলো বেরোয়, তা' কাঠের মত অস্বচ্ছ পদার্থও ভেদ ক'রে চলতে পারে। তিনি সে সময় এ আলোর কোন কারণ বের করতে পারেন নি ব'লে এর নাম দিয়েছিলেন এক্স-রে (X-ray)। কোন অনিশ্চিত বিষয় বোঝাতে গেলেই ইংরাজীতে 'এক্স' কথাটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আজকাল অবশ্য এই 'এক্স-রে' সম্বন্ধে অনেক কথাই জানা গেছে এবং এর সাহায্যে জড়বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে।

রাবার শক্ত করা

রাবার জিনিষটি আজকাল আমাদের অনেক কাজে আসে। রাবারের বল, খেলনা, পুতুল, মোটরের টায়ার, টিউব ইত্যাদি অনেক কিছুই রাবার দিয়ে তৈরী হয়ে থাকে। অথচ প্রায় একশো বছর আগেও রাবার কি ভাবে শক্ত ক'রে কাজে লাগান যেতে পারে এ ছিল বৈজ্ঞানিকদের একটা মস্ত সমস্যা! আমেরিকার চার্লস্ গুড্ইয়ার ব'লে একজন সাহেব এ নিয়ে

নানারকম গবেষণা করতে থাকেন। একদিন তিনি রাবারের সহিত খানিকটে গন্ধক মিশিয়ে পরীক্ষা করবার সময় তা' তাঁর হাত থেকে প'ড়ে যায়। মাটীতে পড়লে অবশ্য কোন লাভ হ'ত না। কিন্তু ভাগ্যক্রমে তা' একেবারে জ্বলন্ত উনানের উপর পড়ল! তিনি তৎক্ষণাৎ তা' তুলে' নিলেন। ঠাণ্ডা হ'তে দেখা গেল যে, গন্ধক-মিশ্রিত রাবার বেশ শক্ত হয়ে গেছে। বৈজ্ঞানিকেরা যেজন্য এতদিন প্রাণপাত পরিশ্রম করছিলেন, এক দৈব ঘটনায় তা' সিদ্ধ হয়ে গেল। রাবারের এ পরিবর্ত্তনকে ভাল্‌কানাইজিং বলে। এ ভাবে রাবার ভাল্‌কানাইজ করার ফলে রাবারের ব্যবসায়ে একটা যুগান্তরের সূচনা হ'ল।

ঘড়ি

ঘড়ি আজকাল ঘরে ঘরে। ঘড়ি না হ'লে আজকাল চলেই না। এই ঘড়ির তৈরীর মূল তথ্যটিও এমনি হঠাৎই আবিষ্কৃত হয়েছিল।

গ্যালিলিও ছিলেন্ ইটালীর একজন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্। একদিন তিনি তাঁর এক পীড়িত বন্ধুর বিছানার পাশে ব'সে আছেন, মাথার উপর একটা ঝাড় লণ্ঠন আস্তে আস্তে দুল্‌ছে। গ্যালিলিওর চোখ লণ্ঠনটির দিকে আকৃষ্ট হ'ল। তাঁর মনে হ'ল লণ্ঠনটির এক একবার দোলবার সময় যেন ঠিক একই।

তাঁর এ অনুমান সত্যি কিনা কি ক'রে পরীক্ষা করবেন ? তিনি তাড়াতাড়ি বা' হাত দিয়ে ডান হাতের নাড়ী টিপে ধরলেন। নাড়ীর স্পন্দন গুণে দেখলেন তাঁর অনুমান মিথ্যে হয় নি। এই তথ্যটুকুর উপর নির্ভর ক'রেই দোলক ঘড়ির (clock) আবিষ্কার হ'ল। তার পর আস্তে আস্তে নানা উন্নতি হয়ে হয়ে আজকাল আংটি ঘড়ির মত ছোট ঘড়ি তৈরীও সম্ভব হয়েছে !

ইলেকট্রিসিটি

সহরে যাঁরা থাকেন তাঁদের পক্ষে ইলেকট্রিসিটি ত' আজকাল একবারে অপরিহার্য্য। বর্ত্তমান যুগ ইলেকট্রিসিটিরই যুগ ! পাঁচ মিনিটের জন্য যদি ইলেকট্রিক লাইন খারাপ হয়, তক্ষুণি একবারে হুলস্থূল প'ড়ে যায়। লাইট্ বন্ধ, ফ্যান্ বন্ধ, ফ্যাক্টরীর কাজকর্ম্ম বন্ধ ! এত যে দরকারী ইলেকট্রিসিটি তার আবিষ্কারও হঠাৎ হয়েছিল।

ইটালীদেশেরই অধ্যাপক গ্যালভানি ক্লাশে ছেলেদের পড়াচ্ছেন ; একটু দূরে লোহার রেলিংএর উপর তামার তার দিয়ে একটা মরা ব্যাঙ ঝুলান ছিল। বাতাসের দোলায় ব্যাঙটি যেই রেলিংএ লাগছিল অমনি তা' এক-একবার কুঁচকে উঠতে লাগল। গ্যালভানির চোখ হঠাৎ এই

আকুঞ্চন-প্রসারণরত ব্যাঙ-এর উপর পড়ে এবং তিনি তার রহস্যের উদ্ধার করবার চেষ্টায় লেগে যায়। তিনি এ ব্যাপার নিয়ে এতটা তন্ময় হ'য়ে পড়েছিলেন যে, সকলেই তাঁকে 'ব্যাঙ নাচানো অধ্যাপক' ব'লে ঠাট্টা করতে সুরু করল। সেদিন এই 'ব্যাঙ নাচানো' পাগলা অধ্যাপকটি যে তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন, তার মধ্যেই ছিল তড়িৎপ্রবাহের মূল রহস্য। গ্যালভানির নামকে অক্ষয় করবার জন্য তাঁর নাম অনুসারে চল-বিদ্যুৎকে বলা হয় গ্যালভানিক্ ইলেকট্রিসিটি!

স্যাকেরিন

তোমাদের মধ্যে অনেকেই জান যে, যাঁরা বহুমূত্র রোগে ভোগেন ডাক্তাররা তাঁদের চিনি খেতে বারণ করেন। মিষ্টি না খেয়ে যাঁরা পারেন না, তাঁরা চিনির বদলে খান স্যাকেরিন। এ জিনিষটি সাধারণ চিনির চেয়ে তিনশো গুণ বেশী মিষ্টি। অর্থাৎ যেখানে আধমণ চিনির দরকার সেখানে এক ছটাকের সামান্য একটু বেশী স্যাকেরিনই যথেষ্ট।

আমেরিকার রাসায়নিক পণ্ডিত ইরা রেমসেন একদিন তাঁর লেবরেটরীতে আল্‌কাতরা নিয়ে কতকগুলি পরীক্ষা সেরে বাড়ী এসে খেতে বসেই দেখেন, যা' মুখে দেন তাই বেজায় মিষ্টি লাগছে। রাঁধুনী সব খাবারেই খুব বেশী ক'রে মিষ্টি

দিয়েছে মনে ক'রে তাকে একচোট গালিগালাজ করলেন। রাঁধুনী বেচারী কিন্তু মিষ্টি মোটেই দেয়নি। কিন্তু মনিবের কথার মৃদু প্রতিবাদ ছাড়া আর ত' কোন কথা বলা চলে না! তাই সে চুপ ক'রেই সেই গালি হজম করলে।

খেতে খেতে হঠাৎ রেমসেনের একটা আঙ্গুল তাঁর জিভে লেগে গেল। তখন টের পেলেন যে, রাঁধুনীর দোষ নয়, তাঁর হাতই মিষ্টি। তিনি বার বার তাঁর হাত খুব ভালো ক'রেই পরিষ্কার করলেন। কিন্তু যতই ধোন হাতের মিষ্টি আর কিছুতেই যায় না!

তখন তিনি খাওয়া-দাওয়া ফেলে ছুটলেন তাঁর লেবরেটরীতে। সেখানে প্রত্যেকটি জিনিষ পরীক্ষা ক'রে এমন একটি জিনিষ আবিষ্কার করলেন যার মিষ্টত্ব চিনির চেয়ে তিনশো গুণ বেশী। তারই নাম স্যাকেরিন।

ফটোগ্রাফি

ক্যামেরার সাহায্যে ছবি তোলা আজকাল খুবই সহজ হয়েছে। তোমাদের মধ্যেও অনেকে নিজ হাতে ছবি তুলে থাকবে। এই ফটোগ্রাফির আবিষ্কার কে করেছেন জান? তাঁর নাম ডেগুরে। রঙ্গমঞ্চে ছবি আঁকা ছিল তাঁর পেশা। যে-সব ছবি তিনি আঁকতেন তাকে চিরদিনের জন্য কি ক'রে

ধ'রে রাখা যায় একদিন তাঁর মাথায় এ চিন্তা ঢুকল। শেষে এটা এমন নেশার মত হয়ে গেল যে, তিনি দিন-রাত এ নিয়ে পরিশ্রম করতে লাগলেন।

তিনি জানতেন যে, সিল্ভার নাইট্রেটে আলো লাগা মাত্র তা' কালো হয়ে যায়। একদিন তিনি একটা রূপার থালায় আয়োডিন রেখেছেন, এমন সময় হঠাৎ দেখলেন যে, পাশের একটি চামচের ছায়া থালাটিতে বসে' গেছে। তিনি এর কারণ খুঁজতে গিয়ে আবিষ্কার করলেন যে, আয়োডিন-সংযুক্ত রূপার থালারও আলোক-চিত্র নেবার ক্ষমতা আছে। তবে তাতে অনেক সময় লাগে, আর তা' ছাড়া এতে রোদের দরকার।

একদিন তিনি একটা ফটো নেবার উদ্দেশ্যে রূপার থালায় আয়োডিনের বাষ্প রেখে তা' রোদে দিবেন, এমন সময় হঠাৎ আকাশে মেঘ ক'রে এল। মনের দুঃখে তিনি থালাখানা একটা দেরাজের ভেতর বন্ধ ক'রে রাখলেন। ঘটনাচক্রে দেরাজের ভেতরে খানিকটা পারাও ছিল। পরদিন দেরাজ খুলে ডেগুরে সাহেব সবিস্ময়ে দেখলেন যে, চমৎকার একটি ফটো উঠে' রয়েছে। তিনি এ ব্যাপারটি নিয়ে গবেষণা সুরু করলেন এবং আবিষ্কার করলেন যে, ফটো নিতে হ'লে খুব বেশীক্ষণ রোদের প্রয়োজন নেই। সামান্য কিছুক্ষণ রোদের আলো লাগিয়ে পরে অন্য কোন রাসায়নিক জিনিষের সাহায্যেই ফটোটিকে ফুটিয়ে

তোলা যায়। এখানে পারার বাষ্পই এই ফুটিয়ে তোলবার কাজ করেছিল।

তারপর অবশ্য ফটোগ্রাফির নানাদিকেই নানা উন্নতি হয়েছে। কিন্তু সবার মূলে রয়েছে ডেগুরে সাহেবের এই আবিষ্কার, আর তারও মূলে রয়েছে সেদিনের সেই মেঘলা আকাশ আর দেরাজের ভেতরের পারার শিশি!

জড় ও জীবনের রহস্য

আমাদের দেশেও আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু জড়ের মধ্যে জীবনের সন্ধান লাভ এবং জড় ও জীবনের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন ক'রে যে মহামূল্যবান্ আবিষ্কারে সমস্ত জগৎকে বিস্ময়বিমূঢ় ক'রে দিয়ে জগৎ-সভায় ভারতের মুখ উজ্জ্বল ক'রে গেছেন তার মূলেও রয়েছে এমনি হঠাৎ-এর খেলা। তাঁর লেবরেটরীতে একটি ধাতুর তৈরী সূক্ষ্ম যন্ত্র নিয়ে কাজ করতে করতে তিনি একদিন হঠাৎ দেখতে পেলেন, যন্ত্রী যেন কিছুকালের জন্য একবারে অচল হয়ে গেল, আবার একটু পরই আপনা থেকেই আগের মতই স্বাভাবিক গতিতে কাজ করতে লাগল। যন্ত্রটির এই অদ্ভুত আচরণের রহস্য বের করতে গিয়েই তিনি আবিষ্কার করলেন যে, জড় ও জীবিত প্রাণীর আচরণ একই নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

*   *   *

এমন বহু গল্প আছে। তোমাদের মাত্র কয়েকটি বলা হ'ল। এগুলি শুনে তোমাদের নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে যে, বিজ্ঞানের এই সব আবিষ্কার খুবই সোজা, আর অমনিই হয়ে গেছে। মোটেই তা' নয়। হঠাৎ এসব হ'লেও এর এক-একটির পেছনে যে কত বড় বড় বৈজ্ঞানিকের কত প্রাণপাত পরিশ্রম রয়েছে, তা' যেন ভুলে যেয়ো না।

তাঁদের একনিষ্ঠ সাধনার সহিত ছিল গভীর অন্তর্দ্দৃষ্টি। তাই অতি সামান্য কিছুও তাঁদের চোখ এড়াতে পারেনি। তোমরাও বড় হয়ে যদি বিজ্ঞান-সাধনাকে জীবনের ব্রত বলে' গ্রহণ কর, আর তোমাদের আশে-পাশে যা' ঘটছে—তা' ছোট হোক্ বড় হোক্—তাদের সম্বন্ধে গভীরভাবে ভাবতে শেখো, তা' হ'লে তোমরাও হয়ত একদিন এমন এক-একটা বড় বড় আবিষ্কারে বিশ্বশুদ্ধ সকলের তাক্ লাগিয়ে দেবে। তোমাদের জীবনে যেন সে শুভদিন আসে। বাংলার ছেলে তোমরা, তোমাদের কৃতিত্বে বাংলা-মায়ের মুখ যেন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে!

নিম্নলিখিত পুস্তকে শতকরা ২৫৲ কমিশন দেওয়া হইবে।

[মফঃস্বল হইতে ভিঃ পিঃ ডাকে পুস্তক লইলে সিকি মূল্য অগ্রিম পাঠাইতে হইবে]

প্রত্যেকখানি ॥০ আট আনা

চিন্তা	—	বরদাকান্ত মজুমদার
সাবিত্রী	—	ঐ
প্রহ্লাদ	—	ঐ
ভগবানের লীলাখেলা	—	ঐ
রূপ-সনাতন	—	দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়
পদ্মিনী	—	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
* ভীমসেন	—	ঐ
গল্পের লহর	—	ঐ
শ্রীমন্ত	—	চন্দ্রকান্ত দত্ত-সরস্বতী
কালকেতু	—	ঐ
সীতা	—	পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
বেহুলা	—	ঐ
উমা	—	বসন্তকুমার দাস
সংযুক্তা	—	সতীশচন্দ্র ঘোষ
শকুন্তলা	—	অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত
* ভীষ্ম	—	নরেন্দ্রনাথ মজুমদার
* পুরস্কার	—	যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
* মায়ের বুকে	—	ঐ
* রাক্ষসের দেশ	—	সত্যচরণ চক্রবর্ত্তী
নীলপাখী	—	সরোজকুমার সেন